সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৪২

২১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট পুরাণ প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[দ্বিচত্বারিংশ ভাগ]

বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে*

খৃষ্টীয় ১৫৭৪ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে বাদশাহ আকবর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিহার প্রদেশে পাঠান-অধিকার ধ্বংস করিলেন এবং সেই ভূমিখণ্ড বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ সাম্রাজ্যে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। পাটনার দুর্গ মুঘল-বাহিনীর হাতে পড়া অনিবার্য্য দেখিয়া পাঠান-রাজ দাউদ তৎপূর্ব্বেই দ্রুতবেগে বঙ্গদেশে পলাইয়া গেলেন। অমনি বাদশাহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য এক প্রবল সৈন্যদল (খাঁ-খানান্ মুনীম খাঁ, রাজা টোডরমল্ল প্রভৃতি বাছা বাছা সেনাপতির অধীনে) বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। এই বাহিনীর এক বিভাগ মজনু কাক্‌শাল-এর নেতৃত্বে ঘোড়াঘাট "সরকার" (= জেলা), অর্থাৎ বিগুড়া-দিনাজপুরে গিয়া, তথাকার পাঠান জাগিরদার সুলেমান মঙ্কালীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সে জেলা দখল করিল। অপর এক বিভাগ, মুহম্মদ কুলী বর্‌লাস্ এর অধীনে সাতগাঁও অর্থাৎ হুগলী অঞ্চল অধিকার করিল। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গে আফঘানশক্তি বিতাড়িত ও মুঘল-শাসন ঘোষিত হইল। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন, তিন সুবার মধ্যে এই ছোট জঙ্গলী প্রদেশ মাত্র এখন তাঁহার হাতে থাকিল। সে যুগে মেদিনীপুর নামে কোন জেলা ছিল না, মেদিনীপুর শহরটি জালেশ্বর জেলা (= "সরকার")এর মধ্যে একটি সামান্য স্থান মাত্র ছিল; আর বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা পরগণা দুটি সুবা বাঙ্গালার মন্দারণ জেলার অংশ বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্গে পাঠান-রাজত্ব শেষ হইবামাত্র দাউদের প্রধান মন্ত্রী (তাঁহাকে ফারসীতে দাউদের "দ্বিতীয় অন্তরাত্মা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) শ্রীহরি অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের পিতা, যশোর-খুলনার মত অগম্য স্থানে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মুঘলদের ছোট ছোট দ্রুতগামী দল বাক্‌লা (= বরিশাল), সোণারগাঁও (= ঢাকা) প্রভৃতি অঞ্চলে পর্য্যন্ত গিয়া বাদশাহের অধিকার স্থাপিত করিল।

বঙ্গে বাদশাহী বাহিনীর প্রধান নেতা মুনীম খাঁ এ দেশের রাজধানী তাঁড়া (= গৌড় বা মালদহের নিকট) শহরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অপরাপর সেনাপতিদের বর্দ্ধমানে রাখিলেন, এই শহর হইল তাঁহাদের অগ্রগামী কেন্দ্র (advanced base for operations)।

---

* বর্ষ ১৩৪২, ১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এক মাসের মধ্যে সমস্ত দেশ মুঘলদের পক্ষে নিঃশত্রু হইয়া গেল। আর অমনি বঙ্গ-বিজেতারা গা ঢিল দিয়া এই সুজলা সুফলা "নরম" দেশে সুখ ও আরাম ভোগে মগ্ন হইলেন।

পরিপক্কবুদ্ধি টোডরমল্ল বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "চল, আমরা উড়িষ্যায় গিয়া দাউদকে ধরিয়া বা মারিয়া একেবারে নিষ্কণ্টক হই।" অনেক জেদের পর তিনি সম্মতি পাইয়া, মাঝারি রকম একটি সৈন্যদল লইয়া বর্দ্ধমান হইতে উড়িষ্যার পথে মন্দারণে অগ্রসর হইলেন। [গড় মন্দারণ হুগলী জেলার আরামবাগ শহর হইতে আট মাইল পশ্চিমে, এবং গোঘাট ও বাসুদেবপুরের মধ্যস্থলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ফারসী গ্রন্থের মন্দারণ শব্দটি সর্ব্বত্রই যে গড় মন্দারণ অর্থে ব্যবহৃত, তাহা নহে; ঐ জেলার যে কোন স্থান হইতে পারে; কারণ, জেলা ও জেলার কেন্দ্র একই শব্দ দ্বারা সূচিত হয়।]

মন্দারণে পৌঁছিয়া টোডরমল্ল গুপ্তচরদেব নিকট সংবাদ পাইলেন যে, পলায়মান দাউদ পথে থামিয়া ডেব্‌রা-কসারিতে[১] ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ইচ্ছা যে, যুদ্ধ করিবেন। টোডরমল্ল ওখানে শিবির করিয়া, মুনীম খাঁকে লিখিয়া আরও সৈন্য আনাইলেন, এবং পরে তাহাদেব লইয়া মন্দারণ হইতে কলিয়া গ্রামে (মেদিনীপুব হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে) পৌঁছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দাউদ পিছাইয়া গড়হরিপুরে গেলেন। এই হরিপুর দাঁতন রেল-ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।

ইতিমধ্যে দাউদের খুড়তুত ভাই জুনেদ খাঁ, বাদশাহী চাকরি লইয়া গুজরাত-অভিযানে যাইবাব পর. তথা হইতে সসৈন্য পলাইয়া, ছোটনাগপুবেব বনপথ দিয়া কাসিয়ার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দাউদেব সহযোগে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ কবা। কিন্তু দুই ভাইয়েরই মেজাজ সমান অহঙ্কাব ও বাগে পূর্ণ, শীঘ্রই ঝগড়া বাধিল, জুনেদ নিজ দল লইয়া পৃথক্ হইয়া গেলেন, এবং ঐ জঙ্গলমধ্যে নিজেই লুঠপাট আবস্ত করিয়া দিলেন। টোডরমল্ল তাঁহার বিরুদ্ধে আবুল কাসিম নমকিন্-কে পাঠাইলেন, কিন্তু কাসিমের অবহেলার ফলে এই মুঘলদল অকস্মাৎ আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। তখন টোডবমল্ল স্বয়ং অগ্রসর হইলেন, তাহা শুনিয়া জুনেদ পলাইয়া গেলেন। বাজা মেদিনীপুব শহরে গিয়া থামিলেন। এখানে মুহম্মদ কুলী বরলাস্ ব্যারামে মারা গেল, মুঘল সৈন্যগণ অত্যন্ত হতাশ্বাস হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল; বলিতে লাগিল, "এই বন-জঙ্গলে আর কত দিন যুদ্ধ করিব?" কেহ সেনাপতির কথা মানে না।

১। মেদিনীপুর শহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাশিয়ারি নামক একটি বড় শহর আছে; ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা হইতে বঙ্গে আসিবার পথে এটা একটি খুব বড় ঘাটী-স্থান (Strategic point)। কিন্তু এ স্থানটি উপরের কসারি নহে; কারণ, তব্‌কাতের মতে উপরের কসারি মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্বে। তব্‌কাতের লিথোগ্রাফ করা মূলে শব্দটি দেহ্-ই-কসারি (অর্থাৎ কসারি গ্রাম), ডেব্‌রা-কসারি ইত্যাদি পড়া যাইতে পারে। আমি ডেব্‌রা-কসারি পাঠ গ্রহণ করিলাম। ম্যাপে পাই, মেদিনীপুরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে ডেব্‌রা আর ডেব্‌রার ৪ মাইল পশ্চিমে কুসিয়া। ইহা চারি রাস্তার মিলনস্থান।

তখন টোডরমল্ল বাধ্য হইয়া মন্দারণে ফিরিলেন। কিন্তু এখানে আর একজন বড় মুঘল-নেতা কিয়া খাঁ কংক্ (অথবা লঙ্গ=খোঁড়া) অসন্তুষ্ট সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া সেনাপতির মতের বিরুদ্ধে বাদশাহের দরবারে ফিরিবার জন্য রওনা হইলেন। টোডর মল্ল কি করেন? কিয়া খাঁর পশ্চাতে দৌড়াইয়া গিয়া অনেক মিনতি ও অর্থ উপহার দিয়া, তাঁহাকে মন্দারণে ফিরাইয়া আনিলেন। [আকবরনামার মতে টোডরমল্ল স্বয়ং যান নাই, দূত পাঠাইয়া এই কাজটি সম্পন্ন করেন।]

ইতিমধ্যে প্রধান সেনাপতি মুনীম খাঁ এই সব কলহ, সৈন্যবিদ্রোহ ও চিত্ত-দুর্ব্বলতার সংবাদ পাইয়া বর্দ্ধমানের ঘাটী হইতে অনেক নুতন সৈন্য টোডরমল্লের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, এবং রাজা মন্দারণ হইতে পুনর্ব্বার কুচ করিলে, মুনীম খাঁ স্বয়ং আসিয়া "চেতো"তে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

এখানে চরেরা সংবাদ দিল যে, দাউদ গড়হরিপুরের শিবিরের চারি দিকে গভীর পরিখা খুঁড়িয়া, মাটির দেওয়াল তুলিয়া, স্থানটী অজেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আর, মেদিনীপুর শহর হইতে ঐ গড় এবং জলেশ্বর পর্য্যন্ত যে দক্ষিণ-মুখী প্রচলিত রাস্তা আছে, তাহা নানা স্থানে কাটিয়া, কাঠের বেড়া (barricade) দিয়া, এবং দুপাশের জঙ্গলের মধ্যে নিজ সৈন্যদের গুপ্ত ঘাটী রচনা করিয়া বসিয়া আছেন, যে, যেই বাদশাহী সৈন্য ঐ পথে আসিবে, তাহাদের ওঁৎ পাইয়া হঠাৎ আক্রমণে (ambush) ধ্বংস করিবেন। শুনিয়া মুঘল-বাহিনী আবও হতাশ্বাস হইল এবং দাউদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া দিল্লী আগ্রায় ফিরিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। মুনীম খাঁ ও টোডরমল্ল অনেক বক্তৃতা করিয়া তাহাদের আবার যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। দাউদের গড়ে সোজা পথে যাওয়া বিপদ্জনক, এ জন্য বাদশাহী নেতারা স্থানীয় জমিদারদের জিজ্ঞাসা করিয়া, মেদিনীপুর-দাঁতন-জলেশ্বর রাস্তার পূর্ব্ব দিক্ দিয়া ধনুকের মত বাঁকা (detour) একটি অপরিচিত গ্রাম্য পথ বাহির করিলেন, এবং বেলদার পাঠাইয়া তাহা কতকটা সমতল ও চওড়া করিলেন। সেই পথ ধরিয়া সমস্ত বাদশাহী সৈন্য নান্জুরাতে[২] পৌছিল।

সুদক্ষ মুঘল সেনাপতির এই রণকৌশলে দাউদের সব শ্রম বিনাযুদ্ধে পণ্ড হইয়া গেল। শত্রু তাঁহার পূর্ব্বপার্শ্বে উপস্থিত, আর একদিনের কুচ করিলেই তাঁহার পলায়নের পথ বন্ধ করিবে, গড়হরিপুর ও উড়িষ্যার মধ্যের পথ দখল করিয়া বসিবে। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া দাউদ আগে হইতে নিজ পরিবার, এবং ভারী মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি কটকে পাঠাইয়া দিয়া, সঙ্গের সৈন্যদলকে হাল্কা, যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত ও দ্রুতগামী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পাঠান নরপতি শত্রুকে আর সময় না দিয়া, একরাত্রির মধ্যে হরিপুর হইতে কুচ করিয়া, ৩রা মার্চ্চ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রত্যূষে নান্জুরার ৩ মাইল পশ্চিমে তুর্কা-কস্‌বা [অপর নাম তুকরাই]র ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

২। রেনেলের ম্যাপ ও অন্যত্র 'নানজুরা' লেখা; কিন্তু নবীনতম সার্ভে ম্যাপে Nahanjara নাম। বালুকি দাঁতন রেল-ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল ঠিক পূর্ব্বে, এবং মেদিনীপুর-কাঁথী রোডের ২ মাইল পশ্চিমে; সৌরী বা কোটিয়াম্ হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে।

মুঘল সেনানীগণ পূর্ব্বে ইহার কোন সংবাদই পান নাই। তাহার উপর নক্ষত্র অশুভ থাকার জন্ত সে দিন যুদ্ধ করিবেন না, এরূপ আগেই স্থির করিয়া, প্রত্যহের মত সে দিনও প্রাতে সামান্ত দু-এক শ অশ্বারোহী সৈন্তকে নিজ শিবিরের সম্মুখে পাহারা দিবার জন্ত পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ পাঠান বাহিনী রণসজ্জায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মুনীম খাঁ তাড়াতাড়ি নিজ সৈন্তদলকে বর্ম্ম অস্ত্র পরিয়া, বাহনে চড়িয়া, রণব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা দিলেন।

মুঘল বাহিনীর মুখ পশ্চিম দিকে। সেনামুখ (vanguard) খাঁ-আলমের নেতৃত্বে; দক্ষিণ বাহুর (right wing) অধ্যক্ষ শাহম্ খাঁ, কেন্দ্রের (centre) কর্ত্তা স্বয়ং মুনীম্ খাঁ, বাম বাহুর (left wing) আশ্‌রফ্‌ খাঁ, টোডরমল্ল প্রভৃতি, ইল্‌তিমশ্‌ (advanced reserve) কিয়া খাঁর অধীনে।

পাঠান সৈন্তগণ পূর্ব্বমুখ করিয়া অগ্রসব হইল। সর্ব্বপ্রথমে এক সারি ধরিয়া বঙ্গের বিখ্যাত রণমত্ত হস্তী, গুজব খাঁর কর্ত্তৃত্বে। কেন্দ্রে স্বয়ং দাউদ, বাম বাহুতে ইস্‌মাইল খাঁ (পাঠানদের খাঁ-খানাঁ); দক্ষিণ বাহুতে সিকান্দর খাঁ (উড়িষ্যার নায়েব-শাসনকর্ত্তা জহান খাঁর ভ্রাতা)।

কিন্তু সমগ্র বাদশাহী সৈন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ স্থানে পৌছিবাব পূর্ব্বেই পাঠানদের হাতীগুলি প্রবল বন্তার মত মুনীম খাঁব অগ্রগামী বিভাগের উপব আসিয়া পড়িল।

বঙ্গীয় মত্ত হস্তীদের দাঁতে কাল চামরী গরুব লেজ ঝুলান ছিল, তাহাদের মাথা এবং অর্দ্ধেক শুঁড় ঐরূপ কাল লোমশ চামে ঢাকা ছিল। এই বীভৎস বেশে সজ্জিত পর্ব্বত-প্রমাণ জানোয়ারগুলি বৃংহণ করিতে করিতে যখন ছুটিয়া আক্রমণ করিল, তখন বাদশাহী সৈন্তমধ্যে মহাভয় এবং চমক পড়িয়া গেল, খাঁ-আলমেব অধীন অগ্রগামী বিভাগের উপর উহারা প্রথমে আসিয়া পড়ায়, তাহাদের ঘোড়াগুলি ভড়্‌কাইয়া পিছু ফিরিয়া পলাইতে লাগিল; আবোহীদের শত চেষ্টাও তাহাদের থামাইতে পারিল না, এই দল ছত্রভঙ্গ হইল। খাঁ-আলমের ঘোড়াটি পুরাতন রণদক্ষ, তাহাব পিঠে থাকিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে এক হাতীর আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন, আর অমনি আফঘানগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিল।

তখন বিজয়ী গুজর খাঁ অগ্রসর হইয়া ইলতিম্‌শ্‌এর উপব গিয়া পড়িলেন, আর সেই বিভাগ নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল, যদিও সেনানী মুহম্মদ খাঁ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিলেন। তাহার পর উল্লাসে উন্মত্ত আফঘান অগ্রবাহিনী বাদশাহী সৈন্তের কেন্দ্র আক্রমণ করিল।

সেই প্রবল আঘাতের ফলে অপ্রস্তুত, অগঠিত, ত্রস্ত কেন্দ্রীয় দলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। "মুনীম খাঁ এবং অন্তান্ত কর্ম্মচারিগণ মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, এবং বার বার আহত হইলেন ..কিন্তু তাঁহাদের সাধারণ সৈনিকগণ বীরোচিত কাজ করিল না।" অবশেষে পলায়মান নিজ সৈন্তদের চাপে প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চাতে অসহায়ভাবে তাড়িত হইলেন।

পাঠানদের সামনে আর শত্রু নাই। জয়ে পাগল পাঠানগণ তখন মহামূল্য মুঘল-শিবির লুঠ করিতে ঢুকিল; তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার শিবির ছাড়িয়া, সেখান হইতে যে সব অনুচরগণ মাল বোঝাই উঠ, ঘোড়া, হাতী লইয়া পশ্চাতে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের সামগ্রী কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইল। এই ক্ষেত্রেও "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" সত্য প্রমাণিত হইল। পাঠানেরা "বাজি জিতিয়াও হাত হারাইল।" কারণ, বাদশাহী পাঁচটী দলের মধ্যে দুটী তখনও প্রবলভাবে দণ্ডায়মান, এবং অপর দুটী বিচলিত, তাড়িত বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়-বিজয়ী পাঠানগণ দল ভাঙ্গিয়া, স্বস্বপ্রধান হইয়া, লুঠের লোভে ছড়াইয়া পড়াতে যুদ্ধের শেষ ফল ঠিক বিপরীত হইল।

দাউদ সুযোগ হারাইলেন। যখন উন্মত্ত হস্তীগুলির আক্রমণে বাদশাহী সেনামুখ, ইল্‌তিমশ্‌ এবং কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া গেল, তখন যদি দাউদ নিজ কেন্দ্রদল লইয়া মুঘলব্যূহের সেই শূন্য মধ্যভাগে প্রবেশ করিতেন এবং মুঘলদের অবিজিত বাম বাহুর দলকে উহার বগল হইতে আক্রমণ করিয়া, সেই মুঘল সৈন্যদলের সম্মুখে আক্রমণকারী পাঠানদলের ঠিক সময় মত সহায়তা করিতেন, তবে তাঁহার জয় অনিবার্য্য হইত। কিন্তু তিনি সাহস পাইলেন না; ভাবিলেন যে, হয় ত মুঘল কেন্দ্র পলাইবার ভাণ করিয়া মধ্যক্ষেত্র খালি রাখিয়াছে, যদি আমি সেই স্থলে ঢুকি, তবে শত্রুর দুপাশের (flank) দলের চাপে এবং হঠাৎ প্রত্যাগত কেন্দ্রীয় অশ্বারোহীর সম্মুখ আক্রমণে একেবারে পিষিয়া মরিব। যুদ্ধ এক রকম দ্যূতক্রীড়া। যে খেলোয়াড় ঠিক সময়ে সর্ব্বস্ব পণ না করিতে পারে, তাহার জয় হয় না। গুজর খাঁর অপ্রতিহত বিক্রম ক্ষণিক চাকচিক্য দিয়া নিবিয়া গেল। কারণ, তাঁহার সফলতাকে স্থায়ী করিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে কেহই অগ্রসর হইল না।

পাঠানদের দক্ষিণ বাহু (সিকন্দর খাঁর অধীনে) সম্মুখবর্ত্তী বাদশাহী দলের (অর্থাৎ মুঘল বাম বাহুর) বিপক্ষে আধ আধ অস্ত্র আস্ফালন (demonstration) করিল। কিন্তু এই দলের নেতা টোডরমল্ল প্রভৃতি প্রবীণ যোদ্ধারা দৃঢ় হইয়া থাকিলেন, এবং যেই পাল্‌টে আক্রমণ (counter attack) করিবার চিহ্ন দেখাইলেন, অমনি ঐ দলের পাঠানেরা বিনা যুদ্ধে পিছাইতে লাগিল। দাউদ তাহাদের পৃষ্ঠপোষণের জন্য আসিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে পলায়মান বাদশাহী সৈন্যরা আবার একত্রিত হইয়াছে এবং রণক্ষেত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। অনেক স্থলে পাঁচ সাত জন বীরের চারি দিকে এক একটী ছোট মুঘল অশ্বারোহীর দল গঠিত হইয়াছে, এবং তাহারা তুর্কী-প্রণালীতে ঘোড়া ঘুরাইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীর চালাইয়া, পশ্চাদ্ধাবনকারী পাঠানদের উপর আক্রমণ করিতেছে। এইরূপ একটী তীরে গুজর খাঁ বিদ্ধ হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে মরিয়া পড়িলেন। সেনাপতির তিরোধানে সমস্ত পাঠান সেনামুখ (vanguard) রণ-ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। এমন সময় আহত মুনীম খাঁ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আবার সেনা চালনার ভার নিলেন। প্রথম প্রথম পাঠানদের বাম বাহুর আক্রমণে বাদশাহী দক্ষিণ বাহু কতকটা বিচলিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত দলের নায়ক শাহম্‌ খাঁ অপরিপক্ক যোদ্ধা, ভীরুও বটে। "গুজর খাঁর উন্মত্ত হস্তিদলের অর্দ্ধম্য আক্রমণের সফলতা এবং বাদশাহী সেনামুখ ও কেন্দ্রের পলায়নসংবাদ পাইয়া,

শাহম্ খাঁ দৃঢ়তা হারাইলেন এবং পিছাইতে লাগিলেন।" কিন্তু তাঁহার সাহসী নিম্ন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া ফিরাইলেন, এবং বীরতার সহিত শত্রুদের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। "অল্পক্ষণেই তাহাদের সম্মুখীন শত্রুবিভাগ বিতাড়িত হইল, এবং এই বিজয়ী মুঘল দল পাঠানদের কেন্দ্রের উপর অগ্রসর হইল।"

দাউদের এখন মহাবিপদ্, তাঁহার সেনামুখ কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহার দক্ষিণ ও বাম বাহু পলায়িত, আর বিজয়ী বাদশাহী সৈন্যগণ তাঁহার দুই পাশে অগ্রসর হইতেছে। অতএব পাঠানদের কেন্দ্রীয় বিভাগ আর বেশী ক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। (যখন গুজর খাঁর মৃত্যু ও তাঁহার অনুচরগণের ধ্বংসের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমস্ত অবশিষ্ট পাঠান সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে অবারিত বেগে শেষ আশা ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। অমনি উন্মত্ত মুঘলেরা পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিল, বিনা বাধায় শত্রুদের মারিয়া লুঠ করিতে লাগিল।) "নিহতদের রক্তে সমস্ত মাঠটা লাল ফুলের বাগান (tulip garden)এর মত দেখাইতে লাগিল।"

যুদ্ধের পরদিন মুনীম খাঁ কঠোর প্রতিশোধ লইলেন। নিরস্ত্র, রণশ্রান্ত, আত্মসমর্পণকারী পাঠান সৈন্যদের ধরিয়া ধরিয়া, তাহাদের মাথা কাটিয়া, সেই মাথা দিয়া আঠারটি স্তূপ রচনা করিলেন—যেমন তাঁহার প্রভুর পূর্ব্বপুরুষ তাইমুর আশী হাজার মনুষ্যমস্তক গাঁথিয়া একটি স্তূপ রচনা করেন। বৃদ্ধ খাঁ-খানার বয়স তখন ৮২ বৎসর, এবং তিনি পূর্ব্বদিনের অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরদেহ।

সত্য বটে, এই যুদ্ধে বাদশাহের পক্ষে অনেক বড় কর্ম্মচারী হতাহত হন। কিন্তু পাঠানদের পরাজয় এই এক যুদ্ধেই চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হইল, বঙ্গে মুঘল রাজত্ব স্থাপিত হইল, যদিও পরে কয়েকবার পাঠান বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার জের জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের প্রথম ভাগে উসমানের মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিয়াছিল (১৬০৯)।

তুকরাই হইতে দাউদ এক নিশ্বাসে কটক পর্য্যন্ত পলাইয়া গেলেন, তাঁহার পাছে পাছে টোডরমল্ল ছুটিয়া চলিলেন। ১২ই এপ্রিল হতাশ পাঠান-রাজ কটকদুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, অবরোধকারী মুঘলশিবিরে মুনীম খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া, বাদশাহের অধীনতা মানিয়া লইলেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার

এই প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত ম্যাপগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে—

(১) Rennell's *Bengal Atlas*, ১৭৭৫ খৃঃ অঙ্কিত, ১৭৮১ প্রকাশিত।

(২) *Calcutta and Agra Gazetter*, ১৮৩১এ ম্যাপ অঙ্কিত।

(৩) Dantan Thana Maps, 1=inch 400 feet.

(৪) সর্ব্বনূতন Survey Map, 1″=1 mile.

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

(১৮৬২)

সংবাদপত্র

বিশ্বমনোরঞ্জন

১২৬৮ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৬২) মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের কথা ১৮৬২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়াবি (৩ ফাল্গুন ১২৬৮) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পাঠে জানা যায়। 'ঢাকাপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> নূতন পত্রিকা। অল্পদিন হইল, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে একটী বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বিগত মাঘ মাসাবধি তাহাতে 'বিশ্ব মনোরঞ্জন' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বাঙ্গালী

১৮৬২ সনেব এপ্রিল মাসে 'বাঙ্গালী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রেসিডেন্সি প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ১৯এ মে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> বিবিধ সংবাদ।—৩০এ বৈশাখ।···আমরা বাঙ্গালী নামক সাপ্তাহিক পত্রের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইযাছি। এই পত্র খানি উত্তম রূপে লিখিত হইতেছে। আমাদিগের বলবৃদ্ধি যতই হয়, ততই মঙ্গল। সেই মঙ্গল বাঙ্গালী পত্র দ্বারা সাধিত হইবে আমরা এ আশা করি'তছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাঙ্গালী' পত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ৫ই জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।···১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারেব বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলোদয়

'মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৬৯) প্রকাশিত হয়।* প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

* "The Week. Tuesday 22nd April.—We have received the first issue of a Bengally weekly called Mongolodoy."—*The Hindoo Patriot* for 28th April 1862.

আমরা মঙ্গলোদয় নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। ইহা প্রতি মঙ্গল-বারে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে তাহা যে প্রকারে লিখিত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে। (সোমপ্রকাশ, ১২ মে ১৮৬২)

ইহা কলিকাতা মৃজাপুর লেন ১।২ নং গৃহে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (সোমপ্রকাশ, ১৯ মে ১৮৬২)

বঙ্গোজ্জ্বল

'বঙ্গোজ্জ্বল' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ৩০এ জুন তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

বিবিধ সংবাদ।—১১ই আষাঢ় ১২৬৯, মঙ্গলবার। আমরা বঙ্গোজ্জ্বল নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আপাততঃ আমরা এই মাত্র কহিতে পারি ইহাতে যে রাশি রাশি পদ্য প্রচারিত হইয়া থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক যদি সামাজিক ও বাঙ্গালাসংক্রান্তবিষয়ক প্রস্তাব লিখনে মনোনিবেশ করেন সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৬২ সনের জুন মাসে 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ৩০এ জুন তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা ঢাকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৬৩ সনের ২রা জুলাই 'ঢাকা-প্রকাশ' লিখিয়াছিলেন যে "গত দুই সপ্তাহ হইতে" 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

মাসিক পত্রিকা

শুভকরী পত্রিকা

১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালী গ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন ; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান ; ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" ইহার দুই বৎসর পরে এই সভাকর্ত্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সভার কর্ম্মচারী।—

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ... সভাপতি।
" " কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ধনাধ্যক্ষ।
" " রামসদয় ভট্টাচার্য্য ... পত্রিকা সম্পাদক।
" " নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পত্রিকার সহকারী সম্পাদক
" " হেরম্বলাল গোস্বামী ... সভা সম্পাদক।"*

'শুভকরী' পত্রিকাব সম্পাদক পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য্য উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

'শুভকরী' পত্রিকা কলিকাতায় মুদ্রিত হইত এবং প্রত্যেক সংখ্যা মাসেব শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যাব প্রকাশকাল—৩০এ বৈশাখ ১২৬৯ সাল। পত্রিকার কণ্ঠদেশে ছাপা হইত—

জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।

'শুভকরী' পত্রিকাব প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করা গেল :—

মুখবন্ধ। কেহ কোন নূতন বিষয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে স্বভাবতঃই লোকে তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। সুতরাং আমরা কোন্ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে 'শুভকরী' প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম জানিবার নিমিত্ত পাঠকবর্গ অবশ্যই কৌতুহলী হইতে পারেন। আমরা পাঠকবর্গের জিজ্ঞাসায় কদাচ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারি না। সর্ব্বথা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া নিম্নে শুভকরী প্রচারের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে দেশীয় ভাষার যেরূপ আলোচনা হইতেছে তাহাতে বোধ হয় এমন সময় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকে যথাপযুক্তরূপে মনোযোগী হইলে অচির-কাল মধ্যেই ইহার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে উদ্যুক্ত হইতেছেন না।

কোন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন উহা কেবল আমাদের আত্মোপকারার্থেই প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু গুণবান্ লোক দ্বারা সংসারের উপকার দর্শিবে এই অভিপ্রায়েই বিতরিত হইয়াছে। আমরা যে উদ্দেশে আলোক প্রজ্বালিত করিয়া থাকি পরমেশ্বরও সেই অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রদীপের উপকার হইবে বলিয়া কেহই আলোক সমুজ্জ্বল করে না; ব্যক্তিবিশেষের অন্তঃকরণ বিমল হইবে ভাবিয়াও পরমেশ্বর তাঁহাকে গুণ সম্পন্ন করেন না। যদি আলোক বিকীর্ণ না হয়, যদি তদ্দারা অন্ধকার দূরীভূত না হয়, তবে সেই আলোকে কি ফল? সেইরূপ যদি জ্ঞানালোক বিস্তৃত না হয়, যদি তদ্দারা সংসারের অজ্ঞানান্ধকারের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস না হয়, তবে সেই জ্ঞানালোকেই বা কি ফল? ফলতঃ যদি আমাদের গুণগ্রাম কোন কার্য্যেই না আসিল, তবে সেই গুণগ্রাম থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?

মহাকবির প্রাগুক্ত কয়েকটী অমৃতময় উপদেশ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে অনেকেই জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছেন, কিন্তু কৃপণের ধনের ন্যায়

* "বালী-শুভকরী সভার তৃতীয় বর্ষের বিবরণ পত্রিকা। ২৪এ চৈত্র শকাব্দা ১৭৮৪।" ('শুভকরী,' ৩০এ চৈত্র ১২৬৯ দ্রষ্টব্য)।

সেই জ্ঞান দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না। তাঁহারা নিত্য নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনুপম অভিনব আনন্দ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু দেশীয় ভাষায় তৎসমুদায় অনুবাদ না করিয়া দেশস্থ লোকদিগকে কেন তাদৃশ আনন্দ লাভে বঞ্চিত রাখিতেছেন? তাঁহাদিগকে কি স্বার্থপর বলা যায় না? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যদি ধন বিতরণ না করেন তবে সকলেই তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞান-বিতরণ-পরাঙ্মুখ জ্ঞানীরাও কি তদ্রূপ নিন্দনীয় নহেন? তাঁহাদের মনে করা উচিত যে দুঃখী ব্যক্তিকে ধন দান না করিলে ধনী ব্যক্তি যেরূপ পাপানুবিদ্ধ হন, অজ্ঞান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান না করিলেও তদপেক্ষা অধিক পাপী হইতে হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদিও কএক জন বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অচিরপ্রসূত দেশীয় ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উহার সুশ্রীকতা সম্পাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি ইহার অনেক অঙ্গ অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অনেক অঙ্গ নিতান্ত দুর্ব্বল অনুভূত হইতেছে, অনেক অঙ্গ আজি পর্য্যন্ত উদিতই হয় নাই। কেনই হইবে। বহু জনের আয়াসসাধ্য ব্যাপার কখন কি অল্প সংখ্যক লোকের আয়াসে সাধিত হইতে পারে? কখনই না। ভাষার ঈদৃশ অসম্পূর্ণাবস্থায় যত গ্রন্থ, যত সাহিত্য ও বিজ্ঞান গর্ভ পত্রিকা এবং যত সংবাদ পত্র প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন। তাঁহার রচনা-শক্তির পরিচয় আর অধিক কি দিব, এক কথা বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তই হইতেন না। অমূল্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হওয়াতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ ভাষার কতই উপকার হইয়াছে। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্ম্মনীতি' তিন খণ্ড, 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ বিদ্যা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী-কল্প-বৃক্ষের সুধাময় ফল স্বরূপ। 'বাহ্য বস্তু' অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গ ভাষা মাত্র অধ্যয়নকারী ব্যক্তিরা কত কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। ঐ পুস্তক বিরচিত না হইলে তাঁহারা কি ইংরেজী ভাষায় কুম্ব প্রণীত মনোবিজ্ঞান কদাপি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইতেন? কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী কৃষক বালকেরাও এক্ষণে 'চারুপাঠ' অধ্যয়ন করিয়া আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, হিমশিলা, উষ্ণপ্রস্রবণ, মেঘ ও বৃষ্টি, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের স্বরূপ ও কারণ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া এই সকল বিষয় অবগত হওয়া বোধ করি তাহাদের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। 'সোম প্রকাশ' 'পরিদর্শক' 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র প্রকাশ হওয়াতেও দেশীয় লোকে বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে সুমধুর ও হিতকর গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। 'সোম প্রকাশ' 'পরিদর্শক' ও 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সুন্দররূপে চালাইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহার পরিশ্রম, বুদ্ধি কৌশল ও রচনা-শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা তত্ত্ববোধিনীর নাম সার্থক হইয়াছিল, যিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তত্ত্ববোধিনীকে মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কুমার বাবু এক্ষণে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনীতে প্রায় প্রকাশিত হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক এক খানি বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্র প্রচার

করিয়া আসিতেছিলেন। লোকে উহার দ্বারা বিস্তর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজেন্দ্র বাবুও তাহা হইতে বিরত হইলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয় পরিপূর্ণ এক খানি পত্রিকা প্রচার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু জানি না কি কারণে তাহা অদ্যাপি প্রচারিত হইল না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন মঙ্গলময়ী বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্রিকা সম্প্রতি আর প্রকাশিত হইতেছে না, এবং অচির কাল মধ্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে প্রচারিত হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। আমরা এই অসদ্ভাব নিরাকরণ প্রত্যাশায় এই সুমহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের আশা যেরূপ প্রবল, আমরা তদনুরূপ বিজ্ঞ বা রচনা পটু নহি। আমাদিগের রচনা চিত্তচমৎকারিণী বা মাধুর্য্যশালিনী হইবে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তবে আমাদিগের এই মাত্র ভরসা আছে যে কোন বিষয়ের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিলে যেমন ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কোন সামান্য বস্তু দ্বারাও লোকে ঐ অসদ্ভাব পরিপূরণ করিয়া থাকেন আমাদিগের পত্রিকাও সেই ভাবে জন-সমাজে গৃহীত হইলেও হইতে পারে। আর আমাদিগের রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইতেছে বিবেচনা করিয়া যদি কোন প্রকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ এক খানি পত্রিকা রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও আমরা পূর্ণমনোরথ হইব।

'শুভকরী' পত্রিকা প্রধানতঃ যে-উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ কবিলে জানা যাইবে :—

...কিছু দিন গত হইল সভ্য মহাশয়েরা সভার আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই এক উপায় উদ্ভাবিত করেন। "শুভকরী নাম্নী এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক"।...

পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকা খানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও সাহিত্য পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর আর আমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি না।... আগামী মাস হইতে প্রধানং কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে।

কিন্তু 'শুভকরী' পত্রিকা প্রচারের দ্বারা শেষ-পর্য্যন্ত সভার অর্থানুকূল্য হয় নাই। তিন বৎসর চলিবার পর 'শুভকরী' বন্ধ হইয়া যায়। এই সংবাদে সহযোগী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৮৬৫ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বালীর শুভকরী পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে, বড় দুঃখের বিষয়।

'শুভকরী' পত্রিকার ফাইল।—

● বহরমপুর, রামদাস সেনের লাইব্রেরি :—প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ।

চিত্তরঞ্জিকা

'চিত্তরঞ্জিকা' ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ সালে (১৪ মে ১৮৬২)। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ—

> এই পত্রিকা ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত হইবে, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ আমাদের নিকট পত্র লিখিতে ঢাকা কালেজে বা বাঙ্গালা বাজারের ঠিকানায়, লিখিলেই হইবে।
>
> ঢাকা কালেজ—শ্রীসারদাকান্ত সেন।
>
> প্রকাশক।

অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; ইহা পাঠে 'চিত্তরঞ্জিকা'-প্রচারের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা জানা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা-কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা খণ্ড প্রকাশ করিলাম।
>
> নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্য পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।...
>
> ...সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র।...

'চিত্তরঞ্জিকা'র কোন সংখ্যা আমার হস্তগত হয় নাই। পরলোকগত গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম দুই সংখ্যা ছিল। এই দুই সংখ্যা অবলম্বন করিয়া তিনি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৭৫-৮০) একটি প্রবন্ধ লেখেন। কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থে ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৯২-৯৪) 'চিত্তরঞ্জিকা'র যে বিবরণ আছে, তাহাও গিরিজা বাবু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অবকাশরঞ্জিকা

১৮৬২ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে ঢাকা হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশ-রঞ্জিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। মূল্য।০ আনা।

উক্ত পত্রিকার ভূমিকায় একস্থলে লিখিত হইয়াছে "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠক-গণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

অবকাশ রঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থত ও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস *

১। ভূমিকা

১৩২৩ বঙ্গাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসের পদের পুথী "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সংস্কর্ত্তা শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রাপ্ত পুথীর দেশ ও কাল এবং কবির দেশ সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় আমার সংশয় জানাইয়াছিলাম। তদবধি পনর বৎসর গত হইয়াছে। আমি আমার সংশয়প্রবন্ধে সংস্কর্ত্তার মত খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে স্বীয় মত স্থাপন ও পূর্ব্বভ্রান্তি সংশোধন করিতেছি।

প্রাচীন পুথী পাইলে চারিটি প্রশ্ন চিন্তা করিতে হয়। পুথীর বিষয় ও কবির নাম কি, কোথায় কোন্ শকে লিখিত, এবং কে লেখক বা সংস্কর্ত্তা। কবির নাম পাইলে অন্য চতুষ্প্রশ্ন আসে। কবির কাব্য, দেশ, কাল ও চরিত। কখনও উপকরণ অভাবে, কখনও অনবধানতায় কেহ কেহ উক্ত দ্বিবিধ চতুষ্প্রশ্ন মিশাইয়া ফেলেন, পুথী-সম্বন্ধী প্রশ্নের উত্তর কবি-সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন। একটা উদাহরণ দিই। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথী পাইয়াছি। তদ্দ্বারা পুথী-সম্বন্ধী চতুষ্প্রশ্নের উত্তরও জানিয়াছি। কিন্তু সে উত্তর কবি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কবি কৃত্তিবাসের দেশ ও কাল এবং যৎকিঞ্চিৎ চরিতও জানিয়াছি। তাঁহার কাব্যের দাঁড়া জানিয়াছি, কিন্তু স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আমরা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী পাইয়াছি, পুথী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কবির নিজের পুথী, কিম্বা ইহাতে অন্য কবির পদ মিশ্রিত হইয়াছে, এ প্রশ্ন পর্য্যালোচিত হয় নাই। কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিতর্ক হইয়াছে, তাঁহার চরিত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে এই সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতেছি।

সম্প্রতি ভুলিয়া যাই, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, কি বাঁকুড়ায় ছিলেন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, কি পরে ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সব উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, মনে করি, সে সব অলীক কল্পনা। কৃ-কী গ্রন্থ পাইতেছি, কাব্যগ্রন্থ, গীতিকাব্য। এই কর্ম্মের কারণ কেবল চণ্ডীদাস নহেন, তাঁহার দেশ ও কালও বটে। কার্য্যের কারণ নির্ণয় অতিশয় দুরূহ। প্রথমে 'উহ' রচনাই গতি। তার পর 'বাদ', তার পর 'সিদ্ধান্ত'। উহ হইতে বাদে উঠিতে পারা যায়। কিন্তু বাদ হইতে সিদ্ধান্ত বহু, বহু, দূরে। অসংখ্য বাদ বাদেই রহিয়াছে, তর্কবিতর্ক হইতেছে, সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই।

---

* সন ১৩৪২, ৫ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিচার-সংক্ষেপ নিমিত্ত প্রথমে আমার বাদ বলিতেছি। চণ্ডীদাস ছাতনা-নিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে পদ রচিয়াছিলেন। সে পদ পুথী-বদ্ধ ছিল না। নানা গায়নে গাহিতেন, কবির ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নিজের নিজের পালায় নিজের নিজের রচিত পদ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। গায়নের পালার পদ একত্র করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথীর মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে পুথী অনুলিখিত হইয়াছিল। ✓

এই এই বাদ সবিস্তারে প্রতিপন্ন করিতে পরিষৎ-পত্রিকায় স্থান হইবে না। *সুখের বিষয়, বিদ্বৎ-পত্রিকায় পিষ্টপেষণের ও উদাহরণ-বাহুল্যেরও প্রয়োজন হইবে না।* পরন্তু তদ্দ্বারা পাঠককে অকারণ ক্লিষ্ট করা হইত। কিন্তু সকল পাঠক রাঢ়দেশের পশ্চিম প্রান্তের নিসর্গ ও ইতবৃত্ত অবগত নহেন। দেশ ও কাল না জানিলে বাদে প্রতীতি হইবে না। ১৩৪১ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে "বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা" নামক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের ৫০ মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া নগর। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান সীমা আধুনিক। ইহার নামও আধুনিক। পূর্বকালে এই প্রদেশ কতকগুলি 'ভূমে' বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মল্লভূম এক বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। বিষ্ণুপুরে ইহার রাজধানী ছিল। পশ্চিমে মানভূম। (মানচিত্র পশ্য।) পুরুলিয়া, ইহার বর্ত্তমান নগর। মল্লভূমের পশ্চিমোত্তরে শিখরভূম। বর্তমানে ইহা পঞ্চকোট রাজ্য। ইহার রাজধানী কাশীপুর। এখন শিখরভূম মানভূম জেলার অন্তর্গত। দক্ষিণে মল্লভূম, উত্তরে শিখরভূম, রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্ত এই দুই বিস্তীর্ণ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি ছোট ছোট ভূমও ছিল। তন্মধ্যে সামন্তভূম, মল্লভূম ও শিখরভূমের মাঝে রহিয়াছে। ছাতনা ইহার রাজধানী। সামন্তভূম, শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল। ইং ১৮৭২ সালের পূর্বে মানভূমের পূর্বাংশ গণ্য হইত। কদাচিৎ মল্লরাজ সামন্তভূমকে স্বীয় অধিকারে আনিতেন। ছাতনা বিষ্ণুপুর হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমোত্তরে, কাশীপুর হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে।

পূর্বকালে এই সকল ভূম নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল, প্রস্তরময় শুষ্কদেশ কৃষিকর্মের উপযোগী ছিল না। ভূমিজ, কোল, সমস্তাল, বাউরী প্রভৃতি অন্-আর্যীয় জাতিরা বাস করিত। পরে চারি দিক্ হইতে আর্যীয়েরা আসিয়া, বন কাটাইয়া এখানে ওখানে গ্রাম পাতিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আচার-ব্যবহারে, ভাষা কৃষ্টিতে পশ্চাতে পড়িয়াছিল। এখন বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া নগর হইতে মাত্র ৮ মাইল দূরস্থিত ছাতনায় 'যাঞে খাঞে যাতে খাতে' প্রচলিত আছে। অনেক প্রচলিত শব্দের অর্থবোধ হয় না। মল্লভূমের পূর্বে বর্দ্ধমান ও দক্ষিণে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা। মল্লভূমের এই দুই দিকের ভাষা ও কৃষ্টি অনেকটা আধুনিক। কিন্তু শিখরভূমের সে সুবিধা নাই। স্মৃতি, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি আর্যশাস্ত্র বিদেশাগত আর্যীয়দিকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছিল। তাহারা বিষ্ণু ও শক্তির উপাসনা করিত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নিকটে মনসা, বাসলী প্রভৃতি নানারূপে শক্তি আরাধ্য হইয়াছিলেন। নিরঞ্জন ধর্ম্মও সশক্তি পূজিত হইতেন।

এদেশ জাঙ্গল. ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির আমল পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীন ছিল। এ দেশে তুরুক সওয়ার প্রবেশ করে নাই, গৌড়ের তুর্কী সুলতানের আধিপত্য ছিল না। দক্ষিণ-

রাঢ়েও ছিল না। রাজা মানসিংহের পর দক্ষিণ ও পশ্চিম-রাঢ় বিদেশী বিধর্মীর প্রভুত্ব বুঝিয়াছিল।

কোন কবি তাঁহার দেশ ও কালধর্মের অতীত হইতে পারেন না। কাব্যের ভাবে ভাষায় অলঙ্কারে তাঁহার দেশ ও কালের চিহ্ন থাকে। আমি এই প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিয়াছি, প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। আমি চণ্ডীদাসের প্রতি রাগাত্মিক হইয়াও কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার কাব্য নিরীক্ষণ করিয়াছি। প্রশ্ন ও উত্তর স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি, সকল খণ্ডের পরস্পর যোগ আছে, একটি ছাড়িয়া অপরটি পড়িলে সম্যক্ উত্তর পাওয়া যাইবে না। এই প্রবন্ধে অন্য কবির উল্লেখ না থাকিলে কবি শব্দে চণ্ডীদাস বুঝিতে হইবে। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্তন কৃ-কী, ইহার পুথী কৃ-পুথী বলা যাইবে। কৃ-কীর পদের অঙ্ক দেওয়া নাই, পদের পাশে দিলে দোষ হইত না। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমি অনেক স্থলে পদের প্রতীক দিতে পারিলাম না, পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছি। 'পৃঃ' এই সঙ্কেত না থাকিলেও পৃষ্ঠাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

২। কবির পদের নূতন প্রাপ্ত খাতা

এত দিন কৃ-কী আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিছুদিন হইল, শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু গীতের তাল শিখিবার দুইখানি খাতা পাইয়াছেন।* তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় ১৬টি পদ আছে (১৩৩৯, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের সা-প-প)। একখানি খাতায় (ক খাতায়) ১২৩৭ সাল লেখা আছে। তাহার ভাষা দৃষ্টে এই রকম কালই মনে হয়। অপর খাতায় (খ খাতায়) সাল লেখা নাই। শ্রীযুত বসু মনে করেন, সেখানা ১৫০ বৎসরের।

খাতার কাল পাইতেছি। ইহার দেশ নির্ণয় সোজা হইয়াছে। খাতার স্বামী নিশ্চয় কোন গায়ক ও বাদক। গায়কেরা পুরাতন কিম্বা বিদেশী ভাষায় রচিত গানের ভাষাকে অজ্ঞাতসারে স্বকালের ও স্বদেশের করিয়া ফেলেন। বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের পরিবর্ত্তন হইলে অল্প হয়। বিভক্তি ও প্রত্যয়ের পরিবর্তন অধিক হয়। বড়ুর পদের খাতায় পুরাতন ক-হ-ন্তি খু-জ-ন্তি আছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই এই শব্দ বঙ্গে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু গায়কের নিকটে অবোধ্য হয় নাই। কৃ-কীর খে-ড়্যা (খেলা), প-ড়ি-হা-স (প্রতিভাস) শব্দের ড় কানে লাগে নাই। অধিকন্তু কৃ-কীর প-রি-হা-র, প-ড়ি-হা-র করিতে বাধে নাই। গায়কের দেশে শব্দের আন্ত ওকার অকার হইত।

---

* শ্রীযুত বসু লিখিয়াছেন, তুলাট কাগজের পুথী, কিন্তু কাগজের মাঝে সেলাই থাকিলে খাতা বলি। তুলাট কাগজে সন্দেহ হইতেছে। তুলাট কাগজের খাতা টিকিবে কি? বোধ হয়, খাতা দুখানা শণপাট কাগজের। শতাবধি বৎসর হইতে ইহা দেশী কাগজ নামে খ্যাত। শণ ও ছেঁড়া কাপড় কুটিয়া মাড় মিশাইয়া দেশী কাগজ হইত। খাতা দুখানির মুদ্রণরীতি হেতু পাঠকের অসুবিধা হইয়াছে। পুথী কিম্বা খাতার লিখনের মাঝে মাঝে সংস্কর্তা মন্তব্য করিতে থাকিলে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ক-খাতা, খ-খাতা, এই দুই নাম রাখিয়া পদের বামদিকের কাগজে পদের ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক, তাহার নীচে অন্য খাতার পদের অঙ্ক ও কৃ-কীর পদের পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিলে পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেন। তলটিপ্পনীতে "১৪। খাদ", 'খাদ' শব্দটি লোমাকে ফাঁপরে ফেলিয়াছিল। ছাপবেষ্টনে 'খাই' লিখিলে এই কষ্ট হইত না।

যথা, জ-গা-ন (জোগান), অ-লা-হ (ওলাহ), ম-হি-ল (মোহিল)। শব্দের এই এই বিকার হইতে খাতা দুখানি বিষ্ণুপুরের মনে হয়।

বিষ্ণুপুরে চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দ হইতে গীতবাদ্যের চর্চা আছে। সেখানে গীতবাদ্য-কলাবিৎ রাজানুগ্রহ পাইতেন, তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরার খ্যাতি এখনও আছে। বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতবিশারদ বিখ্যাত রাধিকামোহন-গোস্বামীর ও শ্রীযুত গোপেশ্বর-বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস ও শিক্ষা। বিষ্ণুপুরে জগচ্চন্দ্র-গোস্বামীর গীতবাদ্যের টোল ছিল, এদেশী ও দূরদেশী শিষ্য টোলে আহার ও বাস করিতেন। ইনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে রামশঙ্কর-ভট্টাচার্যের টোল ছিল। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার গায়ক ছিলেন। বোধ হয়, খাতা দুখানি টোলের শিষ্যদের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল।

খাতা দুখানা দক্ষিণ হইতে বাম পাতায় লেখা। ফারসী কেতাবের কায়দা। আমি কটকে ইং ১৮৯১ সালের সেন্সসের সময় একজন গণনাকারীকে এই কায়দায় সেন্সসের খাতা লিখিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি উৎকলীয় বাঙ্গালী, কালেক্টরি কাছারির এক মুহরী। আমার উপর খাতা পরীক্ষার ভার ছিল। আমি এই মুহরীর লেখা খাতা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি করিয়াছেন? খাতার গোড়ার পাতায় কিছু নাই, শেষের পাতায় লেখা?' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, তিনি জমিদারী সেরেস্তায় দক্ষিণ পাতা হইতে বাম পাতায় খাতা লিখিতে শিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জমিদারী সেরেস্তায় থোকা, সেহা, নোয়াজিমা প্রভৃতি যে সব কাগজ লেখা হয়, সে সব দক্ষিণ কোণে গাঁথা। এই কারণে পত্রস্য বামা গতিঃ। এখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বামা গতি আছে। বোধ হয়, বাদক মহাশয় রাজানুগৃহীত ছিলেন।

খাতা দুখানির পদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাইতেছি। পরে আমাদের কাজে লাগিবে। "বিষ্ণুপুরের খাতা" বলিলে এই খাতা বুঝিতে হইবে।

(১) কৃ-কীর পদ বিষ্ণুপুরে একশত বৎসর পূর্বেও সমাদৃত ও গীত হইত।

(২) কৃ-কীর পদের ভাষা তৎকালের হইয়াছিল। কিন্তু অস্তি ক্রিয়া-বিভক্তি রহিয়া গিয়াছিল। কালক্রমে কৃ-কীর এ্যা অনুনাসিকবিহীন হইয়া য়্যা হইয়াছিল।

(৩) খাতার ১৬টি পদেই বড়ু চণ্ডীদাসের নাম আছে। কিন্তু দুইটি পদ কৃ-কীর বড়ুর মনে হয় না। অন্ততঃ কিয়দংশ বড়ুর নহে। একটি পদ, "হরিহর একু দেহ।" এই পদের "শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে" কিছুতে বড়ুর নয়। অপর পদটি "আমি দেব শ্রীহরি।" এই পদের "রাধা শ্যাম" বড়ুর হইতে পারে না। এই দুই পদ হইতে জানিতেছি, দুই শত বৎসর পূর্বেও বড়ুর নাম দিয়া নূতন পদ রচিত হইত। পদ-রচনায় বড়ুর ভঙ্গি রক্ষিত হইত।

(৪) পুথীর দেশ ও কাল একদা চিন্তনীয়। দেশ কিম্বা কাল, একটি ছাড়িয়া অন্যটি চিন্তা করিলে অনুমানে ভুল হইবে। যদি খ খাতা রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ দুই শত বৎসরের মনে হইত। খাতার বয়স জানা আছে বলিয়া বিষ্ণুপুর বলা হইয়াছে।

(৫) পদ ও তাদের রূপ গায়কের মুখে শুনিয়া খাতায় লেখা হয় নাই। বড়ুর পদের পুথী ছিল, সে পুথীর পদ আর কৃ-পুথীর পদ এক ছিল না। অতএব বিষ্ণুপুরে দেড় শত বৎসর পূর্বে কবির পদের অন্য পুথী ছিল।

৩। কৃ-পুথীর দেশ

বিষ্ণুপুরে "খাতা" লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। সে পুরে কৃ-পুথীও পাওয়া গিয়াছিল। পুথীর অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়, সযত্নে অনুলিখিত ও রক্ষিত হইলেও ইহার পাতা নাড়াচাড়া হইত। নইলে পাতার ধার মণ্ডহীন হইত না, মাঝে মাঝে পাতা হারাইত না। পুথীর প্রথম দুই পাতা নাই, শেষের দিকের পাতাও নাই। আদিরসের কাব্যের পুথী, গানের পুথী, রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বোধ হয়, এক গীতার্থী গীত শিখিতে কিম্বা টুকিতে পুথীখানা ঘরে লইয়া গিয়াছিল, হারখণ্ডের সাতখানি পাতা ফিরাইয়া দেয় নাই। এই পাতায় যশোদার কাছে রাধার ও কৃষ্ণের চাতুরালী বর্ণিত ছিল।

পুথীর কাল জানা নাই। পরে এই কাল অনুমান করা যাইবে। কৃ-কীর দুই চারিটা পদ পড়িলেই বুঝি, এক কালের নয়। সে কাল যতই হউক, কবির কালের পরে। কবি তাঁহার দেশের ও কালের ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদ্যে রচনা; এই নিমিত্ত শব্দের সমতা সর্বত্র রক্ষিত হইতে পারে নাই। এই সকল স্থল ব্যতীত কবি অন্যত্র শব্দের, বিশেষতঃ বিভক্তি প্রত্যয়ের একই রূপ রাখিয়াছিলেন। ইহার অন্যথা অসম্ভব। তিনি অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ নির্ভুল প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন সংস্কৃত কোশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, স্বচ্ছন্দে শব্দ বহির্গত হইয়াছে (যেমন, ১২,১৩ পৃঃ)। যদি কৃ-পুথী কবির নিজের পুথী হয়, তাহা হইলে কবির দেশ আর পুথীর দেশ একই। পরে দেখা যাইবে, কবির দেশ ছাতনা (৫ম খণ্ড পশ্য)। যদি কৃ-পুথী কবির না হয়, তাহা হইলে ভাষার অঙ্গের রূপান্তর দেখিয়া পুথীর দেশ অনুমান করিতে হইবে। তখন স্বীকার করিতে হইবে, সে দেশে পদ গীত হইত, গায়নে পদ লিখিয়াছিল। গায়ন সাবধান হইলেও অজ্ঞাতসারে ভাষাকে অনেকটা স্বদেশের করিয়া ফেলিয়াছিল। এখানে ভাষার দুই চারিটা লক্ষণ দিতেছি।

৵০ সংস্কৃত শব্দের আদ্য অ স্থানে আ। যেমন, আ-তি, আ-কা-র-ণ, আ-দ্ভু-ত, আ-প-মা-ন, আ-সু-র। ১০৭২ সালে বাঁকুড়া জেলায় লিখিত দ্বিজ কবিচন্দ্র বা শ্রীকবি শঙ্করকৃত "গোবিন্দমঙ্গল" পুথীতে অনেক শব্দের আদ্য অ স্থানে আ আছে। যেমন, আঞ্জলি, আপচয়, তাথাপি, আদ্ভুত, আবতার, আপার, আর্জ্জুন, ইত্যাদি।* বিষ্ণুপুর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে গড়বেতায় অদ্যাপি ভায়ানক, আদ্ভুত, মাহাদুষ্ট, মাহাজন, আবস্থা, আল্প, তামাল, ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়।

৵• পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বাঁকুড়ায় আদ্য ও স্থানে অ হয়। কৃ-কীতে সম্বোধনে 'ল' 'আল' 'গ' 'আগ' আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটি পদে 'গো' আছে, এবং

---

* বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ-পালিত তাঁহার সংগৃহীত পুথী দেখাইয়া ও আমার প্রয়োজনীয় তথ্য বাহির করিয়া দিয়া এই প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পরে পুথী বলিলে তাঁহার সংগ্রহ বুঝিতে হইবে। সে সব পুথী বাঁকুড়ায় লিখিত। বাঁকুড়া নগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

বহু স্থানে 'আগো' আছে। বিষ্ণুপুরের খাতায় একটি পদে 'গো' আছে। কৃ-কীতে ক-থা (কোথা), আরপিল (আবোপিল) আছে।

৶৹ কৃ-কীতে অব্যয় ও বিভক্তি প্রত্যয়ে চন্দ্রবিন্দু আছে, বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধাতুতে নাই। কেবল একটি ঝাঁ-ট (ঝটিতি) শব্দে এই বিধির ব্যতিক্রম হইয়াছে। ব্যতিক্রমটি শত বৎসর পূর্ব্বে ছাতনায় লিখিত "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথাতেও আছে। কবিচন্দ্রের এক গ্রন্থে এইরূপ অজস্র চন্দ্রবিন্দু আছে, অন্য গ্রন্থে নাই। বিষ্ণুপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল। তাঁহার দেশে বিভক্তি প্রত্যয়ে চন্দ্রবিন্দু ছিল না বলিতে পারি, বিষ্ণুপুরে কিম্বা বাঁকুড়ায় চন্দ্রবিন্দু প্রবেশ করিয়াছে।

।৹ বাঁকুড়ার ভাষায় শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে বল-ন্যাস হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে এই লক্ষণ প্রায় প্রত্যেক শব্দে বর্ত্তমান। যেমন সালবনি—সালব্বনি, হাসি—হাসী, আছে—আছের। কৃ-কীতে অসংখ্য স্থানে ই স্থানে ঈ আছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে ঈ বানান আপনি আসিয়াছে। যেমন, হবী, গতী।

।৶৹ বাঁকুড়ায় ড ঢ যত, রাঢ়ে আর কোথাও তত নাই। পূর্ব্বের ঢ এখন ড় হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ে ড় আছে। পূর্বকালে কতকগুলি শব্দের 'প্রতি' উপসর্গ স্থানে প-ড়ি হইত। যেমন, প্রতিবেশী—পড়িশী, প্রতিমান—পড়িআন। দক্ষিণ-রাঢ়ে ঘ-ড়া (কলসী) আছে, কিন্তু ঘ-ড়ী (ঘটী) নাই। কৃ-কীতে খে-ডা, গ-জ-গ-ড়ি, ঘ-ডী. প-ড়ি-হা-স, প-ড়ি-ভা-স আছে। উত্তররাঢ়ে (বর্দ্ধমান হইতে উত্তর) লেখায় ড আছে কি না সন্দেহ, মুখে একেবারে নাই। অতএব কৃ-পুথী উত্তর কিম্বা দক্ষিণ-রাঢ়ের নয়, পশ্চিম-রাঢ়ের। কৃ-কীতে কোন কোন শব্দের ঢ় স্থানে ড হইয়াছে। গ-ঢ (নির্ম্মাণে) নিশ্চয় গ-ঢ ছিল, গ-ড় ছিল না।

বলা বাহুল্য, একটি কি দুইটি হেতুর অন্বয় দ্বারা পুথীর দেশ কিম্বা কাল অনুমান ন্যায়-সঙ্গত নয়। উপরে পাঁচ লক্ষণে বাঁকুড়ার ভাষার সহিত সাম্য পাইয়াছি। রাঢ়ের অন্য অঞ্চলের ভাষার ব্যতিরেক পাইয়াছি। পুথীখানা বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছে। অতএব বলিতে পারি, সেখানেই লিপীকৃত হইয়াছিল। কৃ-পুথীর মাতৃকা বাঁকুড়ার বলিতে পারি।

৪। কৃ-পুথীর কাল

কবির কাল জানা নাই। তাঁহার কাব্যের পুথীর কাল জানিয়া তাঁহার কাল-অনুমান সত্য হইতে বহুদূরে পড়িতে পারে। যদি জানিতাম, পুথীখানি তাঁহার হস্তলিখিত কিম্বা সমকালিক, তাহা হইলে পুথার কাল হইতে কবির কাল পাইতাম। কবির ও পুথীর কালের অন্তর পাইলে কাব্যে মিশালের সম্ভাবনা করিতে পারা যাইবে। এই হেতু পুথীর কাল বিবেচ্য।

তিন উপায়ে পুথার কাল অনুমান করা যাইতে পারে। (১) ইহার শব্দ ও ব্যাকরণ, (২) ইহার বিষয়, (৩) ইহার অবয়ব। এই তিন উপায় প্রয়োগ করিতে হইলে প্রতিমান চাই, প্রতিমানে দোষ থাকিলে অনুমানও দুষ্ট হইবে। দোষের পরিমাণ জানিলে অনুমান শোধন করিতে পারা যায়। কিন্তু না জানিলে অনুমানে সন্দেহ থাকে। সাক্ষী তিন। তিনকেই

বিবিধ বিধানে পরীক্ষা করিতে হইবে। তিনেরই নিবাস বিষ্ণুপুরে কিম্বা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হওয়া চাই। বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয় সাক্ষীর নিবাস পুথীর দেশে হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, পুথীতে নূতনের চিহ্ন দ্বারা পুথীর কাল অনুমান করিতে হইবে। এই অনুমান অবশ্য স্থূল হইবে।

(১) ভাষা পরীক্ষা। "শূন্যপুরাণে"র কোন কোন অংশের ভাষা কৃ-কীর অপেক্ষা পুরাতন। উভয়ের দেশও বহুদূরবর্ত্তী নয়। কিন্তু "শূন্যপুরাণে"র নানা অংশের কাল অজ্ঞাত। উপস্থিত ক্ষেত্রে সে বইর ভাষা প্রতিমান হইতে পারিল না। আর কোন প্রতিমানও নাই।

এ স্থলে কৃ-কীকেই প্রতিমেয় ও প্রতিমান করি। তদ্দ্বারা উহার স্থিতির তর্ক করা যাইতে পারিবে। ১০ম খণ্ডে এই তর্ক করিয়াছি। এখানে আর দুই একটা হেতু দেখাইতেছি।

৴০ "নীলজলদ সম" ইতি পদে, ৬৮ পৃঃ

(ক) দেবাসুরে মহোদধি মথিলা তোহ্মারে।

"ষোলকলা সংপুন্ন" ইতি পদে, ৬৯ পৃঃ

(খ). সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।

দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥

(খ) বাক্যটি (ক) বাক্যের অনুবাদ। যদি উভয় বাক্যের দেশ এক হয়, (খ) টি অন্ততঃ দুই শত বৎসর পরে রচিত। (খ) বাক্যের কাল পুথীর কাল। সমগ্র "ষোলকলা-সংপুন্ন" ইতি পদটি সে কালের। প্রথম পদের ব্যাকরণ ও দ্বিতীয় পদের ব্যাকরণ কদাপি এককালের নয়। নদীয়ার নিকটবর্ত্তী স্থাননিবাসী মাধবাচার্য্যের "কৃষ্ণমঙ্গল" কাব্যের ভাষা প্রায় (খ) পদ তুল্য। ইনি চৈতন্যদেবের সমকালিক ছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। বাঁকুড়া মন্থরগতি ছিল। সে কারণ আরও কিছু পরে আসিতে হইবে। অতএব (খ) পদটি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কালের। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবি "নীলজলদসম" ইতি পদটি লিখিয়াছিলেন।

৵০ গেলান্ত গেলা, দেন্ত দেউ, করিবাক করিতেঁ, জাগ্নিবাক জাগ্নিতেঁ জাইবারে, ইত্যাদি পদের প্রথমটি হইতে দ্বিতীয় রূপে আসিতে দুই শত আড়াই শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। বিভক্তি প্রত্যয়ের দ্বিবিধ রূপ একই কালে প্রচলিত থাকিতে পারে না। একটি নয়, দুইটি নয়, অনেক আছে। প্রত্যেকের সন্ধ্যাকালও এক হইতে পারে না। অর্থাৎ কবির পদ প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর গীত ও শোধিত হইবার পর কৃ-পুথীতে প্রাপ্ত আকারে আসিয়াছিল। সে আকার তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে হয় না।

(২) বিষয় পরীক্ষা। এই সম্বন্ধেও ১০ম খণ্ড পশ্য। এখানে অন্য দুই হেতু দিতেছি।

৴০ রাধার স্বামীর নাম আ-ই-হ-ন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকে নাম অ-ভি-ম-ন্যু। এই নাম কোন পদে একটি বারও নাই। (১) অ-ভি-ম-ন্যু, স'প্রাকৃতে অ-হি-ম-ণ্ণু। বা'প্রাকৃতে অ-হি-ম-ন্নু হইতে পারিত; কিন্তু অদ্যাপি কোন নিরক্ষর জনের মুখে অর্জ্জুনপুত্রের নামের ভ স্থানে হ হইতে শুনি নাই। কৃ-কীতে আভিমান, আভিরোষ, আভিসার, আভিহাল,

শব্দ আছে। ভ স্থানে হ হয় নাই। কয়েকটি শব্দে ভ স্থানে হ হইয়াছে। যেমন, বিভান-বিহান, বিবাহ—বিভা—বিহা, প্রতিভাস—পডিহাস, কিন্তু হ লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং অ-ভি-ম-ন্যু হইতে আ-ই-হ-ন, নিশ্চিত বলিতে পাবা যায় না। (২) অভিমন্যু শব্দেব অর্থ অতিক্রুদ্ধ। কিন্তু আইহন রাধাকে কখনও ভর্ৎসনা কবে নাই, তাহাকে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহাব ক্রোধন স্বভাবেব লক্ষণ পাওয়া যায় না। মনে রাখিতে হইবে, অভিমন্যু নামটি কল্পিত। সে কল্পনাব মূলে গুণ অবশ্য ছিল। (৩) ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে রাধাব স্বামীব নাম বায়াণ। ব, ভাষায় আগম। অতএব নামটি আ-য়া-ন। আমবা আয়ান নাম শুনিয়া আসিতেছি, অভিমন্যু শুনি নাই। আদ্য স্বব আ হেতু পবেব স্বব আ হইতে পাবে। অর্থাৎ আ-য়া-ন নামেব মূল আ-য়-ন হইতে পারে। কৃষ্ণ-দাস কবিরাজেব "নিগূঢ়তত্ত্বসাব" পুথীতে নামটি আ-য-ন আছে, যদিও অভিমন্যুব পিতার নাম (৯ম খণ্ড)। (৪) কবিব বাধা-কৃষ্ণ বহস্যে (৯ম খণ্ড) বাধা ও বাধাব পিতা মাতা স্বামী জ্যোতিষিক রূপক। তাহাতে অভিমন্যু নাম কল্পনা অসম্ভব। তাহাতে আইহন নিশ্চয় আয়ন, অযনসম্বন্ধী (চন্দ্র)। (৫) আ-য়-ন হইতে আ-ই-হ-ন আসিতে পারিত। ওডিযাতে য় বর্ণের প্রকৃত ধ্বনি আছে। বাঁকুড়াতেও অদ্যাপি আছে। হল্য, পাল্য ইত্যাদি কেবল মুখে নয়, লিখনেও পাওযা যায়। ববকন্যা, বব-কন্যে (প্রায কনিএ)। অর্থাৎ য় উচ্চাবণে ইঅ। বাল্যকালে আমিও শিখিয়াছিলাম। অতএব আ-য়-ন উচ্চাবণে আ-ইঅ-ন। দ্বিতীয় বর্ণে বলন্যাস বাঁকডা ও মানভূমী লক্ষণ। হ দ্বাবা এটি সহজে সিদ্ধ হয়। যেমন, আ-ম্-হা-ব (আম্মার)। সেইরূপ আ-ই-অ-ন স্থানে আ-ই-হ্-ন। কৃ-কীতে আ-য়ি-হ-ন বানানও আছে (৩৬৩ পৃঃ)। ইহাব উচ্চাবণ আইহন নয, য় উচ্চাবণ কবিতে হইবে। আ-ই-হ-ন শব্দেব অশুদ্ধ বাঢ়িয উচ্চাবণে আ-ইঁ-ইঁ ন। বোধ হয, ইহা হইতে ভবানন্দের "হবিবংশে" আ-ই-ম-ন। (৬) শ্রীরূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধমাধবে" অভিমন্যু নাম প্রথম পাইতেছি। তিনি কবির পুথী পাইযাছিলেন (৮ম খণ্ড), আইহন বা আইহঁন নামটিও দেখিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসেব বাধাকৃষ্ণ গ্রহণ কবেন নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেব বায়াণ নামেবও অর্থ কবিতে পাবেন নাই, আইহন নামেব সংস্কৃত রূপ অভিমন্যু কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বয়সে চৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন। তাহাঁর নাটক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বচিত ধবা যাইতে পারে। অতএব কৃ-কীব সংস্কৃত শ্লোক ইহাব পরে গ্রথিত হইয়াছিল। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দেব পরে হইতে পাবে, পূর্বে নয়।

৵০ কবি পাঁচ ছয় স্থানে বাধাব নাসা বর্ণনা কবিযাছেন। "সুপুট নাসা তিলফুলে" (২২৫ পৃঃ), নাসাব অগ্র নিম্নবক্র ও বন্ধ্র গোলাকার। এই হেতু সুপুট। "নাসা নালদণ্ড" (১৯৫ পৃঃ)। নালদণ্ড পদ্মদণ্ড। আর—

ভ্রুহি কামধনু নয়নবাণে। নাসিকা নালিকযন্ত্র সমানে। (৬২ পৃঃ)

নালিক শব্দের অর্থ নল, কিম্বা যাহাতে নলাকাব রন্ধ্র আছে। "নালীকঃ শরশল্যাস্ত্রেষ্প্যজখণ্ডে"—ইতি মেদিনী। নালীক, শব শল্য অস্ত্র পদ্মনাল। নয়নে বাণ আছে, নালীক আবার শূন্যগর্ভ বাণ (নারাচ) হইতে পারে না। শল্যের রন্ধ্র দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গ হইতে

বুঝিতেছি, নালিক যুদ্ধাস্ত্র, আব যন্ত্র। অতএব বন্দুক ভিন্ন আর কিছু হইতে পাবে না। বন্দুকেব নাম নালীক বা নালিক ছিল। অতএব কবির দেশে ও কালে বন্দুক এত প্রচলিত ছিল যে উপমান হইতে পাবিয়াছিল। যদি তাঁহাব নিবাস বিষ্ণুপুবে হয়, তাহা হইলে নালীকের বহু প্রচলনের কাল অনুমান কবিতে পাবা যায়। রাজা বীরহাম্বীব বিষ্ণুপুবে কামান বসাইয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। ইহাব বিশ ত্রিশ বৎসব পূর্বে বিষ্ণুপুব অঞ্চলে বন্দুক সাধাবণ দ্রব্য হইয়া থাকিবে। দুই পুরুষকাল পিছাইয়া গেলেও ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

(৩) অবয়ব-পবীক্ষা। বিষ্ণুপুবেব নিকটবর্তী এক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেব বাডীতে বাজাব পুবাতন কাগজ পত্রেব সঙ্গে কৃ-পুথী ছিল। শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্লভ মনে কবেন, পুথীখানি বাজাব ছিল। দুইভাঁজ তুলাট কাগজেব পাতাব দুই পিঠে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নাডা-চাডায় কাগজেব ভাঁজ ছিঁডিয়া গিয়াছে, মাত্র দুইখানি পাতাব ভাঁজ একেবাবে ছিঁডিয়া যায় নাই, পাতাব দুই পিঠেই লেখা আছে। সে দুই পাতাব অঙ্ক ২১৭ ও ২২২। পুথী তিন হাতে লিখিত। ক-হাতেব কয়েকটি অক্ষব পুবাতন, খ-হাতেব অক্ষব ক-হাতেব অনুকবণ, গ-হাতেব সমুদয় অক্ষব অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুথীব ১৭৬।১, ২০৪—২০৭।১, ২১২, ২১৭।২—১২২।১ পৃষ্ঠায় গ-হাতেব অক্ষব আছে। তন্মধ্যে ১৭৬।১, ২০৪।২, ২০৫।২ পত্রাঙ্কেব এক এক পঙ্‌ক্তিব চিত্র কৃ-কীতে মুদ্রিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, গ-হাতের লিপি দৈবাৎ এক আধ পাতায় নয়, অনেক পাতায়। আমাদেব প্রশ্ন, কোন্ খ্রীষ্টাব্দেব নিকটবর্তী কালে কৃ-পুথী লিখিত হইয়াছিল।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে লিপিতত্ত্ববিৎ বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক-হাতের প্রাচীন অক্ষবেব আকাব নিবীক্ষণ কবিয়া বলিয়াছিলেন, সে সে অক্ষব ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "বোধি-চর্যাবতাব" পুথাব অক্ষব অপেক্ষা পুবাতন। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত কবিয়াছিলেন, কৃ-পুথী উক্ত খ্রীষ্টাব্দেব পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহাব মতে কৃ-পুথী আবও পূর্বে লিখিত।

কিছু দিন হইল, ঢাকা চিত্রশালাব শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আমাকে এক পত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েব উক্ত "সিদ্ধান্ত" সমর্থন কবিয়াছেন। অধিকন্তু, মেদিনীপুব হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্ষিত ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের অক্ষরেব আকাবেব সহিত কৃ-পুথীর ক-হাতেব অক্ষব মিলাইয়া দেখিয়াছেন, এই অক্ষরের আকাব ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দেব পূর্ব্বেব। ইহা হইতে তিনি অনুমান করিয়াছেন, কৃ-পুথী ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

চাবি বৎসর হইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত বাধাগোবিন্দ বসাক মেদিনীপুব হইতে প্রাপ্ত উক্ত বিষ্ণুপুবাণেব পুথীব অক্ষরের আকারের সহিত মিলাইয়া অনুমান করিয়াছেন, কৃ-পুথী ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। বসাক-মহাশয় কৃ-পুথীর গ-হাতের অক্ষরও মিলাইয়াছিলেন।

আমি লিপিতত্ত্ব জানি না। লিপির ক্রম-পরিবর্তনের ধারা নিরূপণ বহু পরিশ্রম, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভ্যাসের কর্ম। কিন্তু বুঝি, প্রতিমেয় ও প্রতিমান লিপি সদেশীয় ও সজাতীয়

না হইলে তুলনার ফলে সন্দেহ থাকে। কারণ, যে কলা এক স্থানে পুরাতন, সে কলা সর্বত্র পুরাতন না হইতে পারে। কৃ-পুথীর লিপিনিরীক্ষক তিন জনই একাধিক পুথী দেখিয়াছেন, কিন্তু একখানাও বিষ্ণুপুরে লিখিত নয়। "বোধিচর্য্যাবতার" বেণুগ্রামে লিখিত। সে কোথায়, বিষ্ণুপুর হইতে কত দূরে, তাহা জানা নাই। ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমান বিষ্ণুপুরাণের পুথী মেদিনীপুর জেলায় পিঙ্গলা নামক গ্রামে লিখিত হইয়াছিল। পিঙ্গলা গ্রামে ডাকঘর আছে, বি এন রেলের পাশকুড়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। পাশকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। সে অঞ্চলের প্রকৃতি ও ভাষা বিষ্ণুপুরের তুল্য নয়। চারি শত বৎসর পূর্বে দুই স্থানের কৃষ্টি ভিন্নপ্রকার ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণীরা নিজ নিজ নাম নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। ভূমিদান-পত্রে দেবতার নাম নাগরীতে লিখিত হইত। ছাতনার রাজা ও রাণীরাও নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। অনেক দিন হইল, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নাগরী লিখিতেন। বিষ্ণুপুরে ও বাঁকুড়া জেলায় অনেক রাজপুতের বাস আছে, কেহ কেহ পুথী লিখিত। শুনিয়াছি, তাহাদের লিপিতে নাগরী ছাঁদ থাকিত। বিষ্ণুপুরে নাগরীপ্রীতি কত কালের, তাহা জানা নাই। অনুমান হয়, হঠাৎ ইদানী জন্মে নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক-হাতের কয়েকটি ব্যঞ্জনাক্ষরে কোণশূন্যতা ও উ স্বরাক্ষরে শৃঙ্গহীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোণশূন্যতা নাগরীর চিহ্ন। ১৫৭৯ শকে=১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে লিখিত "গ্রহণাটবী" নামক পুথীতে এই আকার আছে। ১৪৭৫ শকের=১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ছাতনার আদি বাসলীমন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের ইটে উ অক্ষরের মাথায় শৃঙ্গ নাই।

বস্তুতঃ কৃ-পুথীতেই লিপি-নিরীক্ষকদিগের অনুমানে সন্দেহের হেতু আছে। দৈবক্রমে উহাতে গ-হাতের অক্ষর আছে, আর ভাগ্যক্রমে দুইখানি পাতা আছে—যাহার এক পিঠে ক, অপর পিঠে গ-হাতের লিপি আছে। অতএব বলিতে পারি, কৃ-পুথী সে কালে লিখিত, যে কালে গ-লিপি প্রচলিত ছিল। কারণ, পুরাতন আকার নূতন লিপিতে থাকিতে পারে। আমি পরিষদের পুথীশালার পণ্ডিত শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের = ১৪৭২ শকের নিকটবর্তী কালে লিখিত পুথীর অক্ষরের সহিত গ-হাতের অক্ষর মিলাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি হুগলি জেলার ভাণ্ডাড়া গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১৪৭৫ শকে লিখিত অমরকোষের পুথী ও ১৪৫২ শকে লিখিত রঘুবংশের পুথীর অক্ষরের সহিত মিলাইয়া জানাইয়াছেন, (১) অমরকোষের পুথীর ক চ ণ দ অক্ষর অপেক্ষা কৃকীর গ-হাতের অক্ষর প্রাচীন, (২) রঘুবংশের পুথীর অক্ষরের সহিত গ-অক্ষরের খুব সাদৃশ্য আছে, কেবল ক দ সু অক্ষর কৃ-পুথীতে প্রাচীন। সকল অক্ষরের আকারে অবিকল ঐক্য হইতে পারে না। ক-হাতের এই তিন অক্ষরের আকার ১৫৭৯ শকের 'গ্রহণাটবী' পুথীতে আছে। কৃ-পুথী হইতে ক ও গ-হাতের অঙ্কের আকার দক্ষ হাত দিয়া উদ্ধৃত করাইলাম। পণ্ডিতমহাশয় জানাইয়াছেন, রঘুবংশের পুথীতে কৃ-পুথীর গ-হাতের ৪ ৫ ৭ ৮ অঙ্কের আকার এবং পত্রাঙ্কে পুরাতন ৩, শ্লোকাঙ্কে আধুনিক ৩ আছে। অতএব অঙ্কের আকারেও সাদৃশ্য পাইতেছি।

ভাস্তাড়া গ্রাম উন্নতিশীল, বিষ্ণুপুর হইতে ৫০ মাইল পূর্বদিকে। এত দূরবর্তী স্থানের ১৪৫২ শকে=১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত পুথীর অক্ষরের সহিত কৃ-পুথীর গ-অক্ষরের সাদৃশ্য পাইতেছি। অতএব বলিতে পারি, কৃ-পুথী ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে, পূর্বে নয়।

কেমনে একই পুথীতে ক ও গ-লিপি আসিল, ইহা বুঝিবার নিমিত্ত আমি বাঁকুড়ায় লিখিত খানকয়েক পুথী দেখিয়াছি। আমার ধারণা হইয়াছে, রাজার মুন্সী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে পুরাণা ছাঁদে লিখিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। আমার বোধ হয়, কৃ-পুথীর ক-লিপি বিষ্ণুপুরের রাজার মুন্সীর। খ-লিপি তাঁহার সাহায্যকারীর; ইঁহার হাত তখনও পাকে নাই। গ-লিপি অন্য কর্মচারীর। ইনি তৎকালপ্রচলিত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।*

৫। কবির দেশ

দেড় শত বৎসর পূর্বে মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার "ধর্ম্মমঙ্গলে" লিখিয়াছিলেন, "বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাসুলী"। তাঁহার নিবাস ছাতনা হইতে ৫০ মাইল পূর্বদক্ষিণে ছিল। এত দূরেও ছাতনার বাসলীর প্রসিদ্ধি ছিল। আমি কটকে থাকিবার কালে "কৃষ্ণকীর্তনে সংশয়" লিখিয়াছিলাম, মাণিক গাঙ্গুলীর এই বন্দনা পড়িয়া বাঁকুড়ার দিকে ঝুঁকিয়াছিলাম। তখন বাঁকুড়ার ইতবৃত্ত, ভাষা ও ভাখা জানিতাম না, কৃ-কীর সহিত মিলাইতে পারি নাই।

(১) কবি প্রত্যেক পদের শেষে বা-স-লী বন্দনা করিয়াছেন। কয়েকটা পদে লিখিয়াছেন—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।

'বড়ু' ও 'বাসলীগণ' চণ্ডীদাসের বিশেষণ। অন্য কয়েকটা পদে 'বাসলীগণে' আছে; পয়ারের অন্তিম-অক্ষরের মিল করিতে 'গণে', একারান্ত হইয়াছে।

তিনি কুত্রাপি বা-শু-লী কিম্বা বি-শা-লা-ক্ষী লেখেন নাই। বাসলী ও বিশালাক্ষী পৃথক্ দেবী। বাসলী, মঙ্গলচণ্ডী ও শুভচণ্ডী নহেন (পরে পশ্য)। ছাতনায় বা-স-লী স্ববিগ্রহে আছেন, দুই শত বৎসরের পুরাতন পাথরের মন্দিরে বা-স-লী, এই নাম পাথরে উৎকীর্ণ আছে। শুধু নামে নয়, যে ধ্যানে তাঁহার পূজা হইতেছে, সে ধ্যানেও এই নাম। সে ধ্যান "ধর্মপূজাবিধানে" লিখিত আছে, কৃ-কীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ছাতনা, সামন্তভূমের রাজ-

* আমি পুথীর অঙ্কের আকারে কি দেখিয়াছি, তাহা হয় ত কাহারও কাজে লাগিতে পারে। ১৫৭৯ শকে বিষ্ণুপুরে লিখিত "গ্রহণাটবী" পুথীতে ৫ ও ৮ পুরাতন, কিন্তু ৩ নূতন। ১৬৮১ শকে লিখিত পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর-কৃত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পুথীতে পুরাতন ও নূতন দ্বিবিধ আকারের ৩ আছে। "বৈষ্ণবামৃতলহরী" পুথীতে পত্রাঙ্কে পুরাতন ৩, শ্লোকাঙ্কে নূতন ৩ আছে। মাধবাচার্য্য-কৃত "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" পুথীতে পুরাতন ৪, ৫, ৭, ৮ আছে, কিন্তু পুরাতন ৩ অঙ্কের মাথার পুটলী মোটা ও অদৃশ্য হইয়াছে। মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমকালিক ছিলেন। এই পুথীর লিপিকাল অজ্ঞাত। ১৪৯০ শকের পূর্বের হইতে পারে না। ছাতনার ইটের ১৪৭৫ শকের ৪, ৫ অঙ্ক পুরাতন।

ধানী। বাসলী, সে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি রাজার কুলদেবী হইলেও গ্রামদেবী, যে-সে তাঁহার নিকট মানসিক শোধ করে।*

(২) কৃ-কী হইতে জানিতেছি, বাসলীর গ-ণ (সমূহ. পরিচর-সমূহ) ছিল, কবি সে গণের এক বড়ু ছিলেন। অতএব তিনি কোন রাজপ্রতিষ্ঠিত বাসলীর বড়ু ছিলেন। রাজা গণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ছাতনার রাজার দশাবিপর্যয় হেতু বাসলীর ভোগরাগেরও বিপর্যয় হইয়াছে। এখন গণের মধ্যে মালী ফুল ও জল, গোআলা দুধ, কুম্ভকার হাঁড়ী, কেঅট মাছ, এবং এক লোহার পাতা ও কাঠ যোগায়। কামার পশু বলিদান করে। ইহারা বংশানুক্রমে রাজপ্রদত্ত ভূমি ভোগ করিতেছে। আর দেঘরিয়া নামে ব্রাহ্মণ পূজা করেন, ভোগ দেন। দেঘরিয়া (দেবগৃহ+ইয়া), যাঁহারা দেবগৃহের কর্ম্ম করেন। নামটি পদবী। পূর্বকালে এক এক কর্মের নিমিত্ত এক এক বটু থাকিতেন। "বিষ্ণুপুরের খাতা"য় "বটু চণ্ডীদাস" এইরূপ ভণিতা আছে। সং ব-টু হইতে ব-ড়ু। "শূন্য-পুরাণে" পুষ্পবটু ফুল তুলিতেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, ভুবনেশ্বরে বড়ু নাম বংশগত হইয়াছে, ভুবনেশ্বর শিবের পূজাদির নিমিত্ত বড়ুদের কর্ম আছে। শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্লভ টীকাতে লিখিয়াছেন, বাঁকুড়ায় গোআলা ও কেঅটদের মধ্যে বড়ু পদবী আছে। বোধ হয়, তাহাদের পূর্বপুরুষ কোন ঠাকুরের গণে ছিলেন। ছাতনায় তেলী জাতির মধ্যে 'বাসুলী' সংজ্ঞাও আছে। বোধ হয়, কোন পূর্ব-পুরুষ বাসলীগণে ছিলেন, শীতলের মুড়ি যোগাইতেন। এখন ছাতনায় 'বড়ু' এই নাম নাই, দেঘরিয়া আছে।† ছাতনার রাজার "মদনগোপাল" ঠাকুরেরও দেঘরিয়া আছেন। তাঁহারা অন্য বংশ। এই দেঘরিয়া নাম বাঁকুড়া ছাড়া আর কোথাও নাই। অন্যত্র নাম পূজারী।

(৩) কবির দেশে বন ছিল, (ক) গ্রীষ্মকালে বনে আগুন লাগিত। (খ) সে বনে হরিণ চরিত, লোকে কাণ্ড দ্বারা বধ করিত। (গ) সে বনে খদিরবৃক্ষ বহুশঃ ছিল, বর্ষাকালে ফুল ফুটিত, রাধা খোঁপায় পরিতেন। যথা,—

(ক) "কেনা বাঁশী বাএ" ইতি ২১৪ পৃঃ,
"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি।"
(খ) "ফুটিল কদম ফুল" ইতি ৩১২ পৃঃ,
"বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।" কাণ্ড, বাণ। এখন নাম কাঁড়।
(গ) "খদির কুসুমমালা" ইতি ১৬৩ পৃঃ,

এখন ছাতনা অঞ্চলে কিম্বা বিষ্ণুপুরে নিবিড় বন নাই। কিন্তু ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেও স্থানে স্থানে ঘন বন ছিল। বনে আগুন লাগিত। এখন আর হরিণ চরে না, কিন্তু লোকে এখনও মৃগয়া ভুলে নাই। বনে এখানে ওখানে এখনও খয়ের গাছ আছে। পূর্বকালে অনেক ছিল, খ-য়-রা নামে এক জাতি খদিরনির্যাস বাহির করিত। সে জাতি এখনও আছে।

(৪) কৃষ্ণ ভার বহিবার বাঁহুক, চামড কাঠের নির্মাণ করিয়াছিলেন। দণ্ডটি ঝামা দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করিয়াছিলেন। বাঁশ পাইলে এত কষ্ট করিতে হইত না। কবির বৃন্দাবনে

* ১৩৩০ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" পশ্য।

† গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোড়ু নামে গোত্র আছে। কিন্তু কবি বোড়ু নন, বড়ু ছিলেন। মানুষের নামের পূর্বে গোত্রনাম যুক্ত হয় না।

নানাজাতির বৃক্ষ ছিল, এক ঝাড় বাঁশ ছিল না। ছাতনায় ও বাঁকুড়ায় বাঁশ দুর্লভ, শুখনা কাঁকর্যা পাথর্যা মাটিতে বাঁশ মরিয়া যায়। লোকে, বিশেষতঃ সাঁওতালেরা ফুল, আঁকোড়, কাঁটাশিরীষ প্রভৃতির বাঁক করিয়া থাকে। কাঁটার গোড়া ঘষিয়া লইতে হয়।

(৫) কবির দেশে নদী ছিল, কিন্তু বর্ষাকালেও নদীর বান স্থায়ী হইত না।

"বাধে দুপহর বেলে" ইতি ২০৯ পৃ',

"তিরীর যৌবন রাতির সপন, যেহ্ন নদীকের বানে"।

ছাতনার চারি মাইল পশ্চিমে ও বাঁকুড়া নগরের পাশ দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ গিয়াছে, কিন্তু বান একদিন থাকে। এখনও এবেলা বান, সে বেলা নাই। অন্য ছোট ছোট নদীরও এই দশা।

(৬) লোকে শরৎকালে কবির যমুনা হাঁটিয়া পার হইত।

"চিরদিন নাহি" ইতি ১৬৬ পৃ',

"উপস্থিত ভৈল বড়াযি শরৎ সমএ।

তড়পথে এবে লোক মথুরাক যাএ॥"

বাঁকুড়ায় বর্ষাকালের কিছুদিন ছাড়া অন্য কালে সকল নদীর তড-পথ। কৃষ্ণ বর্ষাকালে ঘাট-দান সাধিয়াছিলেন। স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে বাট-দান ও ঘাট-দান দুইই আছে।

(৭) কবির বৃন্দাবনে প্রায় ১৮০ জাতি গাছ ছিল। কয়েকটা চিনিতে পারি নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় আরণ্য তরু সব বাঁকুড়ার বনে আছে। তিনি যে সব ফুলের নাম করিয়াছেন, সব তাঁহার দেখা। মল্লিকা, মালতী, নেআলী, মাধবী, বাঁকুড়ার কাঁকর্যা মাটিতে অযত্নেও মরে না। কোন্ ঋতুতে কি ফুল ফুটে, তাহা কবির জানা ছিল, একটাতেও ভুল হয় নাই। অন্য ফুল যাহাই হউক, নাগেশ্বর বিনা যত্নে জন্মে না, "গুলাল" (গোলাপ) যেখানে সেখানে দেখা যায় না। কবি কোন বড় রাজার পুষ্পোদ্যান দেখিয়াছিলেন। ছাতনার রাজা নগণ্য ছিলেন। বোধ হয়, কবি বিষ্ণুপুরের রাজার "ফুলবাড়ী" দেখিয়াছিলেন। তিনি হীরা ও মাণিকের প্রধান প্রভেদ জানিতেন (১২২ পৃঃ), "মাণিকে হিরাক বিন্ধে কেবা পাতিআএ।" বই-পড়া বিদ্যা হইতে এই দৃষ্টান্ত মনে আসিত না।

(৮) কবি "বিষ্ণুলোক" লিখিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে পরে পরে দুই বার "বিষ্ণুপুর" লিখিয়াছেন।

"কথা খানি খানি" ইতি পদে ১৯ পৃঃ,

"সে দেবসনে নেহা বাড়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি।"

পুর, পুরী, নগর। লোক, ভুবন। পরে "সুরপুর" দুই বার আছে। কিন্তু ইন্দ্রের অমরাবতী, পুরী। "সুরপুর" লেখায় দোষ হয় নাই।

(৯) কৃ-পুথীর দেশ আর কবির দেশ এক মনে হইতেছে। গায়নে কবির ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে পারেন না, পরিবর্তন আবশ্যক মনে করেন না। কৃ-কীর অনেক শব্দ এখন ওড়িয়াতে বর্তমান। পূর্বকালে রাঢ়ি ও ওড়িয়া ভাষা এক ছিল, সে হেতু কৃ-কীতে ওড়িয়া শব্দ আছে, ইহা সাধ্যকে সিদ্ধভ্রম। সহজ বুদ্ধিতে আসে, কৃ-কীর দেশ ওড়িষ্যার সন্নিকটে ছিল। কৃ-কীর আরণ্য তরু ওড়িষ্যার বনে প্রচুর। মানভূমের ভাষা দক্ষিণ-বিহারী। এই ভাষা

বিশেষ লক্ষ্য কবিতে পারি নাই। কিন্তু বাঁকুড়া নগরেও অদ্যাপি হিন্দী বা মৈথিলীর টান আছে। শিক্ষিত লোকেও বলেন, অমৃৎ (অমৃত), তৃণ্ (তৃণ), অতীত্ (অতীত)। আর, স-ধ্বনি এত যে, কানে নূতন ঠেকে। কৃ-কীতে কয়েকটা সংস্কৃত শব্দেও শ স্থানে স আছে। কৃ-কীব আহ্বাব, কাহ্নাঞি, মাহ্লী প্রভৃতি শব্দ হইতে বুঝি, দ্বিতীয় বর্ণে আঘাত স্পষ্ট ছিল। বানানে আ-হ্বা-ব, উচ্চাবণে আম্হার। সেইরূপ কা-হ্না-ঞি উচ্চারণে কান্হাঞি, মা-হ্লী উচ্চাবণে মাল্হী। বাঙ্গালা ভাষাব নিয়ম এই। ব্রা-হ্ম-ণ লিখিলেও উচ্চাবণে ব্রাম্হন, পবে ব্রাম্ভন। বাঁকুড়ায় নিম্নশ্রেণী বলে, "আমি বল্লী (বলি), চল্লী (চলি)।" পূর্বকালেব বানানে বোহ্লী, চহ্লী হইত।

দেখা গেল, কবিব দেশ নীবস উচ্চ জাঙ্গল। সে দেশেব ভাষায় প্রচুব অর্ধানুস্বাব ছিল, ঢ ড স্বচ্ছন্দে উচ্চাবিত হইত। বিভক্তি-প্রত্যয়ে ওড়িয়া ও দক্ষিণ-বিহাবী ভাষার সাদৃশ্য ছিল। বাসলীব প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ভাষাব লক্ষণে রাঢ়ি ওড়িয়া বিহাবী ভাষাব যোগস্থলে দেশটি বসাইতে হইতেছে। সে দেশ দক্ষিণ-পূর্ব মানভূম। ইংবেজী ১৮৭২ সালেব পূর্বে সামন্তভূম ও ছাতনা মানভূমেব অন্তর্গত ছিল।

কৃ-কীতে নান্নুব গ্রামেব নাম নাই। যেটা নাই, সেটাব অনুসন্ধানও নাই। তথাপি ছাতনায় নান্নুব গ্রাম না পাইয়া, কেহ কেহ প্রচণ্ডা বাসলী দেবীকেও অগ্রাহ্য কবেন। কোন পুবাতন পদে নাই, নান্নুব গ্রামে বাসলীর আলয় ছিল। যে পদে আছে, সে পদ দুই শত বৎসবেব অধিক পুবাতন নয়। যদি সে পদকে প্রমাণ ধবি, সঙ্গে সঙ্গে সাল-তডা গ্রামে বিষহবি নিত্যাদেবীকেও চাই। সালতডা গ্রাম ছাতনাব চাবি পাঁচ ক্রোশ পূর্বদিকে আছে, সেখানে নিত্যাদেবীব আলয়ও আছে। তথাপি কেহ কেহ বীবভূমের নান্নুব গ্রামে বাসলী প্রতিমাব অস্তিত্ব কল্পনা কবিয়া বড়ু কবিকে সেখানে দেখিতে চান। কল্পনাটি যে আকাশকুসুম, তাহা অক্লেশে প্রমাণিত করিতে পাবা যায়। অজয় নদেব দশ মাইল উত্তবে বীরভূম জেলায় প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে নান্নুব নামে গ্রাম ছিল। রেণেল সাহেবের ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাপচিত্রে নামটি না-নো-র। নানোব, নান্নুব, নাম একই। দুই শত বৎসবেব পূর্বেও এই নাম ছিল কি-না, তাহা বলিতে পারা যায় না। পবে দেখা যাইতেছে, কবি ছয় শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। একটা সামান্য গ্রামেব নাম. ছয় শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে, গ্রামটিব অন্য নাম হয় নাই, নাম সংস্কৃত নয়, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হইবে না। গ্রামের বর্তমান নাম না-দু-ড। গত দুই শত বৎসবেব মধ্যে নাম-পরিবর্তন পাইতেছি। ধরি, ছয় শত বৎসর পূর্বে না ন্নু-র নাম ছিল। কিন্তু গ্রামের কেবল নামটি পাইলে চলিবে না, কবির দেশের প্রকৃতির সহিত ঐক্য চাই। এ বিষয়ে নান্নুর সম্পূর্ণ বিপরীত। অজয় নদেব পলিমাটিতে নাদুড় গ্রামেব উৎপত্তি হইয়াছে। সে মাটি নীরস পাথবিআ নয়। গ্রামটি কলিঙ্গেবও নিকটে নয়। সে দেশে কবির ভাষা ছিল না, বলিতে পারা যায়। বিশেষতঃ সে দেশে বাসলীর প্রতিষ্ঠা নাই। নাদুড়ে বাসলীর বিগ্রহ নাই। যে বিগ্রহেব পূজা হইতেছে; সেটি চতুর্ভুজা সরস্বতীর। অগ্নিপুরাণে (৫০ অঃ) এই প্রাচীন সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, ঢাকা-চিত্রশালায় এক সুন্দর সুস্পষ্ট মূর্তি আছে। শ্রীযুত নলিনীকান্ত

ভট্টশালী আমাকে চিত্র দেখাইয়াছেন। এই মূর্তির সাধারণ দুই হস্তে বীণা, অপর দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, বাম হস্তে পুথী। দেবী পদ্মাসনা, সম্মুখে ভক্ত দণ্ডায়মান। নান্নুড়ের প্রতিমা ঠিক এইরূপ। এই প্রতিমা প্রায় চল্লিশ বৎসর মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বমণ্ডলের প্রত্ন-দ্রব্যবিভাগের ইং ১৯১৬।১৭ সালের বিবরণে (Archeological Survey of India, Eastern Circle) এই মূর্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, কিয়দংশের অনুবাদ করিতেছি। "কয়েক বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাসের স্তূপ নামের এক স্তূপ হইতে কৃষ্ণ-শিলার এক মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। লোকে ইহাকে বাশুলী নামে পূজা করিতেছে। তাহারা বলে, চণ্ডীদাস ইহাঁকেই পূজা করিতেন। * * * রূপ দেখিয়া বোধ হয়, এটি ৮ম কিম্বা ৯ম খ্রিষ্টশতাব্দে মাগধী রীতিতে নির্মিত। কিন্তু বাশুলী কি না, সন্দেহের বিষয়।" ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ও এই আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। (পরিষৎ-প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী")। তিনি মূর্তির চিত্রের নীচে লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাশুলী দেবী। (পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্তি)।" কিন্তু মূর্তিটি মৃত্তিকাস্তূপের ভিতরে ছিল, দৈবাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কত কাল ছিল, জানা নাই। ক্রমায়াত প্রসক্তি নাই। অতএব বিনা প্রমাণে "চণ্ডীদাস-পূজিতা বাশুলী" বলিতে পারা যায় না। সে চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস, বিনা প্রমাণে বলিতে পারা যায় না। বিনা প্রমাণে "চতুর্ভুজা বীণাপাণি"কে বাসলী বলিতে পারা যায় না। গ্রাম্য জনে বা-স-লী নাম বা-শু-লী করে, কদাচিৎ বিশালাক্ষীকে বাশুলী বলে। কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর নিত্য পূজার ধ্যানে সে ভ্রম থাকে না। বীণাপাণি সরস্বতীকে কুত্রাপি বিশালাক্ষী বলিতে শুনি নাই। পুরাণে কিম্বা তন্ত্রে সরস্বতীর এক নাম বিশালাক্ষী নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্বাদে শুনিয়াছি, বাসলী ও বিশালাক্ষী ধর্মের দুই পৃথক্ আবরণ-দেবতা। বাসলী প্রবিকটদশনা, রুধির-পানে নৃত্যশীলা, ভয়ঙ্করী, দ্বিভুজা, খড়্গকপালধারিণী। বিশালাক্ষীও দ্বিভুজা, কিন্তু খড়্গ-খেটকধারিণী। ছাতনার বাসলী মিথ্যা প্রমাণিত না হইলে বিশালাক্ষীকে কবির আরাধ্যা বলিতে পারা যায় না। বাসলী ও বিশালাক্ষী অবশ্য বরদা, কিন্তু মঙ্গল-চণ্ডিকা নামে খ্যাত ছিলেন না। মঙ্গলচণ্ডিকা "বরদাভয়হস্তাচ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটকুণ্ডলমণ্ডিতা॥" (রঘুনন্দনধৃত কালিকাপুরাণ)। রোগাদিশান্তির নিমিত্ত মঙ্গলবার হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত গীতাদি ও বলিদান সহ ইহাঁর পূজা হইত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মঙ্গল-চণ্ডীর পূজাপ্রকরণ লিখিত আছে। পূজায় সুরা দেওয়া হইত, নরবলিও হইত। "চৈতন্যভাগবতে" বৃন্দাবনদাস এই মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁর অষ্টাহ পূজার সময়ে দামিন্যা গ্রামের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আট পালায় চণ্ডী গান করিতেন। কিছুদিন হইল, "চণ্ডীদাসচরিত" নামে এক পুথী পাইয়াছি। এই বৎসরের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, দুই শত বৎসর পূর্বে নান্নুরে বিশালাক্ষী দেবী এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে চণ্ডীদাস-নামধারী বিশালাক্ষী-সেবক এক কবি ছিলেন। আরও অনেক কথা আছে। কি হইতে কি হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমুদয় হেতু একত্র বিচার করিলে অন্বয় ও ব্যতিরেক, দ্বিবিধ বিধানে ছাতনা-বাদ সিদ্ধ হইতেছে।

৪। কবির কাল

কৃ-কীতে কবির শক অনুমানের উপকরণ নাই। ইহার পুরাতন ভাষা, পুরাতন বৃন্দাবন, এবং কবির রাধাকৃষ্ণ হইতে বুঝিতেছি, কবি চৈতন্যদেবের বহু পূর্বে ছিলেন। কত পূর্বে, তাহা বহিঃপ্রমাণ দ্বারা অনুমান করিতে হইবে। এখানে তিনটির বিচার করিতেছি।

(১) ছাতনায় "বাসলীমাহাত্ম্য" নামে একখানি সাত পাতার সংস্কৃত পুথী পাওয়া গিয়াছে। কবি সম্বন্ধে এইটি প্রাচীনতম পুথী। ইহাকে কৃত্রিম বুঝিবার কোন হেতু পাই নাই। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সাহানা পুথীর বিবরণ দিয়াছেন। লিপিদৃষ্টে পুথী দেড় শত দুই শত বৎসরের মনে হয়। পত্রাঙ্কের ৩ অঙ্কটির আকার পুরাতন। কবির নাম পদ্মলোচন শর্ম্মা। "দ্বীপেভরামভূমানে শাকে" ১৩৮৭ শকে=১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। বাসলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা কবির উদ্দেশ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

তাতো নিত্যনিরঞ্জনো বুধবরশ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ।
মাতা লক্ষ্মীবিরাপরা গুণবতী বাসিনী বিন্ধ্যপূর্ব্বা॥
ভ্রাতা ধার্ম্মিকধূরিণোঽগ্রজবরঃ শ্রীদেবীদাসো দ্বিজঃ।
ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ॥

তাতের নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবীদাস এবং কনিষ্ঠের নাম চণ্ডীদাস। ইঁহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব (মুখোপাধ্যায়)। দেবীদাস গৃহস্থ হইয়াছিলেন। আরও জানা যায়, পূর্বে বাসলী দেবীর পূজা বিধিমত হইত না। দেবীর স্বপ্নাদেশে ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর-রায় দেবীদাসকে পূজায় নিযুক্ত করেন। আরও জানা যায়, ১৩৮৭ শকের=১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চণ্ডীদাসের কবি-প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। পদ্মলোচন শর্মা দেবীদাসকে 'পিতা' বলিয়াছেন। পিতৃশব্দে বপ্তা আর পিতামহ প্রপিতামহ ইত্যাদি বুঝায়। আর বাসলী দেবীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক পুরুষকালে প্রচারিত হইতে পারে না। বাসলীর দেঘরিয়ারা বলেন, তাঁহারা দেবীদাসের বংশ, এবং পদ্মলোচন শর্মা দেবীদাসের পৌত্র ছিলেন। আরও বলেন, বৃদ্ধ বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হইয়াছিল, চণ্ডীদাসের বিবাহ হয় নাই। বটু শব্দের এক অর্থ ব্রহ্মচারী আছে। (ত্রিকাণ্ডশেষ)। অতএব বটু শব্দের দ্বিবিধ অর্থেই কবি বড়ু ছিলেন। মুখোপাধ্যায় হইয়াও কন্যা না পাইবার কারণ ছিল। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস গ্রামদেবী ও শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত কুলদেবীর পূজারী হইয়া তৎকালের ব্রাহ্মণসমাজে হীন হইয়াছিলেন; এ কথা অন্য এক বংশের দেঘরিয়ার মুখে শুনিয়াছি। কিছুকাল পূর্বেও বাসলীর দেঘরিয়াদের এই অপবাদ ছিল। দেবীদাস বাসলীর পূজা করিতে সম্মত হয়েন নাই। বোধ হয়, রাজা বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলপ্রয়োগে বিবাহ দুর্ঘট। যদি-বা বৃদ্ধ বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হইল, চণ্ডীদাসের হইল না। দেবীদাসের সন্তানদিগকেও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, যুবা বয়সে তাঁহাদের বিবাহ হইত না। পূর্বাপর অবস্থা চিন্তা করিলে এই অনুমান সত্য মনে হয়।

ধবি, দেবীদাস ৪০ বৎসব বয়সে, তৎপুত্র ৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ কবিয়াছিলেন। পদ্মলোচন ৫০ বৎসর বয়সে মাহাত্ম্য বর্ণনা কবিয়াছিলেন। অতএব দেবীদাস ১৩৮৭—(৪০+৪০+৫০=) ১৩০=১২৫৭ শকে, এবং চণ্ডীদাস ১২৬০ শকে=১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) দেঘবিয়ারা বলেন, বর্তমানে দেবীদাসেব পব ২৩ পুরুষ গত হইয়াছে। পুরুষ প্রতি ২৫ বৎসর হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক বয়সে বিবাহ হইতে থাকিলে পুরুষ প্রতি ২৭।২৮ বৎসবও হইতে পাবে। ২৩ পুরুষে ৬০০ বৎসর ধরা যাইতে পাবে। এইরূপে ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের নিকটে দেবীদাসেব জন্ম পাইতেছি। এখানে স্মর্তব্য, কেহ জ্ঞানতঃ পিতৃপুরুষেন নাম পবিবর্তন কবে না। পবিবর্তনেব হেতুও ছিল না। দেঘবিয়ারা পুরুষ গণিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তদ্দ্বাবা আমবা যে চণ্ডীদাসেব কাল অনুমান কবিব, ইহা তাঁহাবা কল্পনাও কবেন নাই।

(৩) পূর্ব খণ্ডে "চণ্ডীদাসচবিত" নামক পুথীব উল্লেখ কবিযাছি। তাহাতেও চণ্ডীদাসেব পিতামাতা ও অগ্রজেব নাম আছে। সে সে নাম "বাসলী-মাহাত্ম্যে"ও আছে। 'বাসলী মাহাত্ম্য" সংক্ষেপে বচিত। যখন বচিত হইযাছিল, তখন ইহাতে বর্ণিত মাহাত্ম্য সকলেই জানিত। ইহাতে ইতবৃত্তমূলক দুইটা ঘটনাব উল্লেখ আছে, এতদিন বুঝিতে পাবা যায নাই। "বাসলী-মাহাত্ম্যে" আছে, একদা ছাতনা নগব দস্যু-সৈন্য দ্বাবা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, বাসলী স্বযং বণে অবতীর্ণ হইযা নগর বক্ষা করিযাছিলেন। "চণ্ডীদাস-চবিতে" এই ঘটনাব বিস্তাবিত বর্ণনা আছে। ইহাতে আছে, মল্লেশ্বর গোপাল সিংহ সসৈন্যে ছত্রিনা (ছাতনাব পূর্বনাম) আক্রমণ কবিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসেব গীতেব সুখ্যাতি শুনিযাছিলেন। 'তিনি ছাতনায় কবিব গীত শুনিয়া ও জ্ঞানেব পরিচয় পাইযা মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাব বয়স জিজ্ঞাসা কবেন। বাজা মনে কবিয়াছিলেন, আঠাব বৎসবের বালক। কবিব উত্তব,

এ কি কথা কহ বাজা চণ্ডিদাস বলে।
আমার বয়স প্রায় তেত্রিশের কোলে॥
জেই দিন মহামুদি ঘোব অত্যাচাবী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা কবি॥
তাব পুর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কি না বল মোরে বালক বয়সে॥ (পত্রাঙ্ক ২১)

দিল্লীব সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলকেব অপঘাত হয়। তাঁহাব পুত্র জুনা খাঁ, অপর নাম মুহম্মদ, অপঘাতেব কর্তা। ৭২৫ হিজবা রবিঅলআওল মাসে এই ঘটনা হয়। দেখিতেছি, ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দেব ১৫ ফেবরুআরি হইতে ১৭ মার্চেব মধ্যে উক্ত কাণ্ড ঘটে। শকে ১২৪৬। ২৪ ফেবরুআবি ১লা চৈত্র হইয়াছিল। চণ্ডীদাস মধুমাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুথীব সহিত মিলিতেছে। "চণ্ডীদাস-চরিতে"র গোপাল সিংহ অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে কানুমল্ল বিষ্ণুপুবের রাজা ছিলেন। বোধ হয়, ইঁহাব ভাল নাম গোপালমল্ল ছিল।

এই মতে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে কবিব জন্ম হইয়াছিল। "বাসলী-মাহাত্ম্য" ও দেঘরিয়াদের

পুরুষ গণনা হইতেও প্রায় এই কাল আসে। বিদ্যাপতির সহিত কবির মিলন হইয়াছিল। "চণ্ডীদাস-চরিতে"ও এই মিলনের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, কবি অপেক্ষা বিদ্যাপতি আট দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে কবির জন্ম হইলে বিদ্যাপতির সহিত মিলন বাধে না। দিল্লীর বার্ত্তা ছাতনাবাসীর কেন স্মরণীয় হইয়াছিল? কে জানে। পুথীতে ইহার উত্তর পাইবার কথা নয়। কিন্তু সে সময়ে ছাতনাতেও এক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সামন্তবংশ সামন্তভূমে রাজ্য করিতেছিলেন। শিখরভূমের শিখরেশ্বর, ভবানী নামক এক ব্রাহ্মণকে এই রাজ্য দিয়াছিলেন। সামন্তেরা বিদ্রোহী ও বাসলীর বরে স্বাধীন হইয়া হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎকালের সামন্তরাজ এক পশ্চিমা ছত্রিকে স্বীয় কন্যা সহ রাজ্য দান করেন। ইনি হামীর-উত্তর নামে রাজা হন এবং ইনিই রাজ্যের নাম ছত্রিনা (ছত্রিনগর) রাখেন। ছাতনার বর্ত্তমান রাজবংশের ইনিই আদি। ছাতনার রাজার এক কর্ম্মচারী ইংরেজীতে এক বংশ-বৃত্তান্ত লিখিয়া বাঁকুড়ার কালেক্টর সাহেবকে দিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৫ "শক" লিখিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি খ্রিষ্টাব্দকে শক করিয়াছিলেন। এই বিদেশী ছত্রি দিল্লী না কোথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সূত্রে দিল্লীর হত্যা, ছাতনার হত্যা এবং চণ্ডীদাসের জন্ম, তিন ঘটনা গ্রথিত হইয়াছিল। বলবত্তর বিরোধী প্রমাণ না পাইলে কবির জন্মকাল ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ স্বীকার করিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর বয়সে, ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার কবিত্বস্ফূর্তি ধরা যাইতে পারে। কৃ-কীর পুরাতন শব্দ ও বিভক্তিপ্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল অসম্ভব হয় না।

ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব। চণ্ডীদাসও বৈষ্ণব ছিলেন। বিষ্ণু পরমপুরুষ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূলীভূত পরমাত্মা। বৈষ্ণবেরা এই বিষ্ণুর ধ্যান করেন। বিষ্ণুপুরাণ এই অর্থে বৈষ্ণব পুরাণ। কিন্তু জগন্ময় সর্বভূতেশ্বর পরমাত্মার ক্রিয়াবত্তা নাই। তাঁহার ইচ্ছায় পরিণামী প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি শক্তিরূপা, সাধকেরা তাঁহাকে নানা রূপে দেখেন। কবি তাঁহাকে চণ্ডীরূপে ভাবনা করিতেন। চণ্ডীর রূপেরও সংখ্যা নাই। বাসলী এক রূপ। অতএব কবি বৈষ্ণব-শাক্ত ছিলেন, পুরুষ প্রকৃতি স্বীকার করিতেন। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণও বৈষ্ণব-শাক্ত ছিলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর পরম পদ ধ্যান করিতেন নানা মূর্তিতে শক্তিপূজাও করিতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" বেদবিহিত, মনুসম্মত। কবির নিকটে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা একটা উপকথা। এই কারণে তিনি দধি-দুগ্ধ-বিক্রয় নিমিত্ত রাধাকে মথুরার হাটে পাঠাইতে, কালীয় দমন ও গোপীর বস্ত্রহরণ স্বীয় কাব্যের ভাবনার অনুযায়ী করিতে পারিয়াছিলেন।

৭। কবির কাব্য

কবি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই কৃষ্ণমঙ্গল রচেন নাই, কীর্ত্তনের সুরে গাহিবার গীত বাঁধেন নাই। তিনি প্রেমলীলা গান করিয়াছেন। দেশে দেশে, কালে কালে কবিকুল

সে গান গাহিয়াছেন, এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ অবলম্বন করিয়া সে গানই গাহিয়াছেন।

দেবগণের স্তুতিতে হরি মর্ত্ত্যলোকে অবতার করিলেন, তাঁহাকে অসুর দলন করিতে হইবে। এই কর্ম্মে রাধার কোন প্রযোজন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণের রসসম্ভোগ কারণে দেবগণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, "আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার। থির হউ সকল সংসার॥" কবি এই একটি বাক্যে সংসারের স্থিতির কারণ ও তাঁহার কাব্যের মূল সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও রাধা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। আইহন নামক এক গোপের সহিত রাধার বিবাহ হইল। কিন্তু "দৈবযোগে" আইহন নপুংসক। রাধার রূপ যৌবন দেখিয়া শাশুড়ী রাধার বড় আয়ীকে রাধার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। কবি সাত আটটি গীতে তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

রাধার বয়স বার বৎসর। গোপজাতি রাধা দধি-দুগ্ধ বিকনিতে সখীজন সঙ্গে বৃন্দাবন দিয়া প্রত্যহ মথুরায় যায়। বড়আয়ী বুঢ়ী সঙ্গে যায়। একদিন বসন্তে বুঢ়ী পেছু পড়িযা গিযাছিল। নাতিআ কাহ্নাঞি সে বনে গোরু রাখিতেছিল। বুঢ়ী কাহ্নাঞিকে রাধার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কে নাতিনী, কেমন রূপ না জানিলে কাহ্নাঞি বলিতে পারিল না। অন্য কে বা বলিতে পারিত? বুঢ়ী রাধার রূপ বলিল। শিরীষ-কুসুম-কোঅঁলী সর্বাঙ্গসুন্দরী, পাতলী বালী। রূপ শুনিয়া কাহ্নাঞির চিত্ত ব্যাকুল। কাহ্নাঞি কর্পূরবাসিত তাম্বূল, চাঁপানাগেশ্বর-নেআলী-মল্লীর মালা, নেতপাটোল ও কস্তুরী চন্দন দিযা বড়ায়ীকে দৌত্যকর্ম্মে পাঠাইল। শুভ-তিথি-বার-ক্ষণ দেখিযা দেবগণ ও "শ্রীরামচরণ" বন্দিযা বড়ায়ি যাত্রা করিযা এক বকুলতলায় রাধার দর্শন পাইল। "কুশলে কি আছহ নাতিনী।" এই বলিযা রাধাকে চুম্বন ও ঘন ঘন আলিঙ্গন করিল। রাধার মন প্রসন্ন হইলে বড়ায়ি "কথা খানি খানি" আরম্ভ করিল। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। রাধা নন্দের রাখোআলের উপহার পাযে ফেলিযা বুঢ়ীকে চড় মারিল।

দূতীর বুদ্ধিতে কুলাইল না, নটবর নাট আরম্ভ করিল। যমুনার ঘাটে বাটদান সাধিতে বসিল। গ্রীষ্ম গতে বর্ষা পড়িল, যমুনা বিশাল। নটক কাহ্নাঞি পাকা পাটের নাঅ গড়িযা ঘাটোআল হইয়া ঘাটদান সাধিতে বসিল। কিন্তু এক নাট কতদিন চলে? শরৎ আসিল, যমুনায় শুড়পথ। কাল কাহ্নাঞি ভারিআ সাজিযা রাধার দধি-দুগ্ধের ভার বহিল, শরতের রৌদ্রে রাধার দেহ 'তোলবলিতে'ছিল, কাহ্নাঞি রাধার মাথায় ছাতা ধরিল। আবার বসন্ত আসিল। বৃন্দাবনে ষড়ঋতু বিদ্যমান, তরুগণ কুসুমিত। ফুল-ফলের লোভে সখীজন সঙ্গে রাধা সে বনে প্রবেশ করিল। "মলয পবন ধীরেঁ বহে। সুগন্ধি কুসুম বিকসএ"॥ বৃন্দাবন, বিলাসের যোগ্য স্থান বটে। গ্রীষ্ম আসিল, কাহ্নাঞি যমুনার কালিয় নাগ দমন করিল, রাধা যমুনায জল লইতে আসিবে। জলকেলি নিমিত্ত বস্ত্রহরণ হইল, নটক কাহ্নাঞি রাধার বসন ফিরাইযা দিল, কিন্তু হারটি লুকাইয়া রাখিল। এই হার লইযা তুমুল কলহ হইল (পুথীতে এখানে সাতখানি পাতা পাওযা যায নাই। বোধ হয) রাধা যশোদার কাছে কাহ্নাঞির গুণাগুণ বলিয়া দিল ইহাতে কাহ্নের ক্রোধ হইবার কথা। তখন বসন্ত কাল। কাহ্ন রাধাকে মদনের পঞ্চবাণ মারিল। এতদিনে, দুই বৎসর পরে, রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা হইযা পড়িলেন। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইযা রাধাকে উতরল করিতে লাগিলেন। রাধা সে বৈরী বাঁশী চুরি করিলেন। বাঁশী হারাইযা কৃষ্ণ হাকন্দ করুণা করিলেন। তিনি যে বাঁশীর সুস্বরে রাধাকে ডাকিতেন, যে বাঁশীতে মধুর স্মৃতি জড়িত ছিল, সে বাঁশী হারাইযা কৃষ্ণের শোক স্বাভাবিক। বহু কষ্টে কৃষ্ণ বাঁশীটি ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু কংসাসুর বধ করিতে মথুরায চলিযা গেলেন, রাধার বিরহ বুঝিলেন না। (পুথিতে আর পাতা পাওযা যায নাই।)

রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি, এই তিনের কর্ম্ম ও উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা এই গীতি-নাট্য ক্রমে-ক্রমে রসঘন হইয়াছে, উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তিনেরই কর্ম স্বাভাবিক। রাধার নারীধর্ম্ম সর্বত্র সুসঙ্গত ও চমৎকার। কৃষ্ণ নটবর, তাঁহার নাটও তেমন। বড়ায়ি অতিবৃদ্ধা, দৌত্যকর্ম্মে

রসভোগ হেতু সে কর্মে নিপুণ। রাধার তেজস্বী বচন, নিষ্ঠুর পরিহাস, মর্মস্পর্শী করুণা বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। কোন কোন গীতের উপরে "তাল প্রকীর্ণক", "তাল লঘক" লিখিত আছে। বোধ হয়, রাগ সমান থাকিলেও রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ির উক্তি-প্রত্যুক্তির সময় তাল সমান থাকিত না। হয় ত তিন গায়ক তিন জনের ভূমিকা করিত।

কবির ভাষার মাধুর্য, ছন্দের ও রাগের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের বাহুল্য ও আদিরসের ভাব বিভাব অনুভাব শ্রোতার অনুভবের বস্তু, টীকাকারের ব্যাখ্যার বস্তু নয়। কবির উপমার ও দৃষ্টান্তের সংখ্যা নাই। সকল কবি দেশ ও কালধর্মের অধীন। কিন্তু আশ্রয়ের ভেদ হেতু রসের স্বরূপের ভেদ হয় না। বর্তমানে আমরা চণ্ডীদাসের দেশে ও কালে নাই, কবির অসামান্য প্রতিভা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। যিনি দেশ ও কালের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া কবির সহিত একাত্ম হইতে পারিবেন, তিনিই দেখিবেন, কবির পদগুলি আকরোত্থিত হীরা। স্থানে স্থানে মাটি লাগিয়া আছে, একটু ঘষিয়া লইলে স্বীয় দীপ্তি বিকীর্ণ করে। আমি "কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" লিখিবার সময় কবিকে চিনিতে পারি নাই। বর্তমান দৃষ্টিতে স্থানে স্থানে অশ্লীল বটে, কিন্তু জয়দেব অশ্লীলতার পথ দেখাইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস সে পথে গিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অল্প দূর যান নাই, ভাগবতপুরাণ গোপীর বস্ত্রহরণ করাইয়াছিলেন।

কবি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেন। তাঁহার দেশে এখনও ঝুমুর আছে। সাঁওতাল নারী ঝুমুর গায়, সে গান বাঙ্গালা, রাধাকৃষ্ণলীলা। এখন বাঁকুড়ায় ঝুমুর মৃতপ্রায়। কিন্তু কৃ-কী ঝুমুর নয়। ইহাতে কঠিন কঠিন রাগ ও তাল আছে। গীতগুলি বর্তমানের 'খেয়াল'। ঝুমুরে রাগের ও তালের পারিপাট্য নাই। বিষয় এক হইলেও তভজা, কবিগান, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতি রাগ তাল ধুআ ও গাইবার ভঙ্গি-ভেদে পৃথক্। ঝুমুর অশ্লীল হইবে, এমন বিধি নাই।*

* বাঁকুড়ায় ঝুমুর লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু খ্যাতি নাই। বাঁকুড়ানগরনিবাসী পীতাম্বর দাসের "ঝুমুরসঙ্গীত" কলিকাতার বটতলায় ছাপা হইয়াছে। কবি কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন মানভূমের ঝুমুর বিখ্যাত। সেখানে এখনও ঝুমুরগীত রচিত হইতেছে। অতি-আধুনিক বিষয়েও হইতেছে। সেখানে হিন্দীতেও ঝুমুরগীত রচিত হইয়াছে। মানভূম জেলায় পাতকুম নামে এক পুরাতন গ্রাম আছে। পুরুলিয়া হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, বি এন রেল ষ্টেশন চাণ্ডিল হইতে দশ বার মাইল পশ্চিমে। ইচাগড় রাজ্যের অন্তর্গত। সেখানকার ঝুমুর বিখ্যাত, লোকে আধুনিক যাত্রাগান না শুনিয়া রাস দোল প্রভৃতি উৎসবে ঝুমুর শুনে। সম্প্রতি শ্রীযুত রামকৃষ্ণ-গাঙ্গুলী বিখ্যাত ঝুমুরিআ। সেখান হইতে সংগৃহীত গোটাকয়েক গীতের প্রথম কলি দিতেছি। শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

১। কবি দীনচৈতন্য

চরণে জাবক, করেছে আলক, পাটলিকুসুম চায়রে। সাজেছে নপুর, আতি সুমধুর, রতি দেখি মুরছায়রে॥ দেখত সুবল ভাইরে। রূপের তলনা দিব কাইরে॥

২। কবি দীনা (বোধ হয়, উপরের দীনচৈতন্য),

এক তরুবর তিনটি শাখা, পঞ্চবক্ষে পত্র আছে অলেখা, তিনপুর ছায়া বাপিয়েঁ। বিনা ফুলে দেখ দুই ফুল আছে, বিনা রসে রস ভরিয়েঁ, সাধুজন দেখ মনে বুঝিয়েঁ। গুরুজন দেখ মনে ভাবিয়েঁ।

৩। কবি ব্রজরাম,

ক্ষুতাতে চলিল হাতি, পিঁপিঁতে মারিল লাথি, সেই হাতি বড় মাতয়াল। সে ত কিছুই না মানে গ। কহতার কে করে বিচার।

ভবানন্দের "হরিবংশে"র ভূমিকায় (৩৮/০ পৃঃ) পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র রায় সংস্কৃত "প্রেমামৃত" কাব্যের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, উহাতে বসন-চৌর্য্য, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড, এই লীলা-চতুষ্টয় আছে। সতীশবাবু খণ্ডের এই ক্রম স্বাভাবিক মনে করিয়া লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ দধি প্রভৃতির পসরা লইয়া মথুরার হাটে যাইতে হইলে শ্রীরাধা প্রভৃতির মত সুকুমারী ব্রজগোপীদিগের সর্ব্বাগ্রেই একজন ভারবাহকের প্রয়োজন এবং তার পরে যমুনা নদী পার হইতে নৌকার এবং হাট হইতে দ্রব্য বিক্রয়ের কড়ি লইয়া ফিরিবার সময় পারের কড়ি অর্থাৎ 'দান' বা শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়"। আমি "প্রেমামৃত" কাব্য দেখি নাই। কিন্তু ইহার চারি খণ্ডের নাম হইতে বুঝিতেছি, ইহার কবি চণ্ডীদাসের চারিটি কুসুম স্থানভ্রষ্ট করিয়া হারমঞ্জরীর সৌন্দর্যের হানি করিয়াছেন। "প্রেমামৃতে"র কবি যিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় বাঙ্গালী। সতীশবাবু মনে করেন, কবি বৃন্দাবনে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি তাঁহার দেশে কিম্বা মথুরায় কোন গোপনারীকে ভারী সঙ্গে লইয়া যাইতে দেখিযাছেন ? যদি ভারীর শিকায় পসরা চাপাইয়া রাধা দধি-দুগ্ধ বেচিতে যাইতেন, পথে কাহ্নাঞিকে ভারী করিবেন কেন ? সতীশ বাবু কাব্যমধু নিরন্তর পান করিয়া সংসারজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস-বর্ণিত বস্ত্রহরণে ভাগবতের অনুকরণ চাহিযাছেন। ভাগবতের উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন দেশের স্বাধীন কবি কৃষ্ণের জল-কেলি বর্ণনা করিয়াছেন। রাধা নবনীদলকোঅঁলী ও "বডার বহুআরী বডার ঝী" হইয়াও কেন মাথায় দই দুধের পসরা লইয়া মথুরার হাটে বেচিতে যাইতেন, সংসার-অভিজ্ঞ বড় আয়ী জানিতেন। দই দুধ না বিকিলে গোআলার জীবন-উপায় থাকে কি ? এই প্রবল যুক্তি মানিয়া খরতর শাশুড়ী রাধাকে হাটে পাঠাইতেন। বডার বহুআরী যেমন-তেমন বেশে হাটে যাইতে পারেন না। রাধা সুরঙ্গ পাটোল, পায়ে নূপুর ও পাসলী পরিয়া [তাঁহাকে আলতা পরিতে হয় নাই, পাযে থলকমল ছিল], কটিতে বসনা, হাতে কঙ্কণ ও বাহুঠী ও উপর-হাতে চুডী, গ্রীবায় গজমুতির "গুণিআ". কণ্ঠে সাতেসরী হার, কানে রতনকুণ্ডল, [তৎকালে নাসাভরণ ছিল না], কপালে সিন্দূরের ফোঁটা এবং খোঁপায চাঁপা-নাগেশ্বর-নেআলী-মালতীর মালা পরিয়া, মাথায় সোনার চুপডীতে সোনার ভাণ্ডে দুধ দই, রূপার ঘটীতে ঘি লইয়া, নেতের আঁচল ঢাকা দিয়া হাটে যাইতেন, দুঅজ পহরে ঘরে ফিরিয়া শাশুড়ীকে কড়ি গণিয়া দিতেন। ভারী বিনা বেতনে ভার বহিত না, তাহাকে কড়ি দিতে হইত। শাশুড়ীর কড়ি থাকিলে যুবতী বহুআরীকে হাটে পাঠাইবেন কেন ? নন্দ গোপেরও ধন থাকিলে, যে পুতার তখনও মাথায় ঘোড়া-চুল, সে শিশুকে বৃন্দাব দুর্গম গহনে গোরু রাখিতে পাঠাইতেন কি ? কৃষ্ণ কটিতে পাটের ধড়ী, পায়ে নূপুর ও মগর খাড়ু, হাতে কঙ্কণ, কানে রতনকুণ্ডল, মাথার চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, সমুখে মণিময় মুকুট পরিয়া গোরু আগলাইতেন। কখনও বা কদমতলায় বসিয়া মণিখচিত সুবর্ণের বাঁশী বাজাইতেন। চণ্ডীদাস গোপজাতির বৃত্তি লোপ করেন নাই। তিনি ব্যতীত আর কেহই যথাঋতুতে যথালীলা দেখিতে পান নাই। একটা লীলাও অহেতুক নয়। কবির অনুকারকেরা নিষ্কারণ প্রণয়কেলি দেখিয়াছেন, চণ্ডীদাস-চোর হইয়া ধরা পড়িয়াছেন। যে পদে দান নৌকা ভার কিম্বা বংশীলীলা আছে,

সে পদের ভাব চণ্ডীদাসের নিকট প্রাপ্ত। যে পদে রাধা চন্দ্রাবলী, আইহন ও বড়ায়ি দূতী আছে, সে পদেব এই এই নাম চণ্ডীদাসের। যে পদে বাসলীর বন্দনা আছে, চণ্ডীদাস নাম আছে, সে পদকর্তা চণ্ডীদাসেব শিষ্য।

৮। কবির প্রখ্যাতি

চৈতন্যদেব কবির পদ শুনিতেন। বোধ হয়, রাধাবিরহের পদ। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "বিদগ্ধমাধবে" কবির বাঁশীচুরি লইয়াছেন। রাধা, কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিয়াছিলেন। কথাটা এমন নয় যে, সকল কবিব মনে আপনিই আসিবে। গোস্বামীঠাকুর যে ছলে বংশী-হরণ আনিয়াছেন, সেটা অর্থহীন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের "বৈষ্ণবতোষণী" টীকায় কবির দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির নাম করিয়াছেন। দুই গোস্বামী কবির পুথী পাইয়াছিলেন, নচেৎ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু ইঁহারা কবির পদ, কি ভাঙ্গা পালা পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। "প্রেমামৃত" কাব্যও বৃন্দাবনে রচিত হইয়াছিল।

মাধবাচার্য তাঁহাব "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে" ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাব মধ্যে দান ও নৌকালীলা প্রবিষ্ট করাইযাছেন। এই দুই লীলা চণ্ডীদাসের। বস্ত্রহরণেব পর গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা দধি দুগ্ধাদি বিক্রয়চ্ছলে বড়াযি সঙ্গে মথুরা যাইতে মন্ত্রণা করিল। এইরূপে দানখণ্ডের আরম্ভ। নৌকাখণ্ডের প্রথম পদ বাঁকুড়ার এক পুথী হইতে উদ্ধৃত হইল

সিন্ধুড়া

মাথায় পসরা, সুন্দরী চলিলা, সব সখিগণ সঙ্গে।
যমুনার ঘাটে, খেয়ারি লম্পটে, ডাক ছাড়ি ঘন রঙ্গে॥
নাগব কানু, না আন ঝাটবে, বেলী উছুব হৈল বিকীব॥
বলে বনমালী, সুন চন্দ্রাবলী, কত বা বাতাহ বোল।
কবি পারাবাবে, জাইহ বিকীবে, আগে ফুরা মোব বোল॥
বলে চন্দ্রাবলী, নহে খেযারী, কিছুই না কবা খণ্ডা।
কর পার হই, জবে কীরি জাই, পাইবে ধনগণ্ডা॥
গোপীর বচন, সুনী মনে মন, হাসে দেব বনমালী।
দ্বীজ মাধব কয়, বস অতিশয়, বাধাকানুব ঢামালী॥

এই ভাবের গীত কৃ-কীতে আছে। সেখানে 'ঘাটিআল' আছে, 'খেয়ারী' নাই। পশ্চিম ও দক্ষিণ-রাঢ়ে ঘাটিআল, ঘেটেল শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। মাধবাচার্যের পর তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস গুরুর সরণী অনুসরিয়া এক "কৃষ্ণমঙ্গল" লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই কৃষ্ণমঙ্গলের পুরাণা পুথী পাওয়া যায় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ মাত্র একশত বৎসরেব পুরাণা পুথী মুদ্রিত করাইয়াছেন। তথাপি বোধ হয়, ইহাতে কৃষ্ণদাসের রচিত পালাগুলির পরিবর্তন হয় নাই। কবি লিখিয়াছেন (১৩৭, ১৫০ পৃঃ), "দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে। অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।" ব্যাসোক্ত হরিবংশে এসব কথা নাই. ছিল না বলিতে পারা যায়। ভবানন্দও হরিবংশের নাম করিয়া নিজে গীতের পালা রচিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস রাধার এক সখীর নাম,

* গীতটি "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে" ৭৫ পৃষ্ঠে আছে। কিছু কিছু পাঠান্তর আছে।

চন্দ্রাবলী রাখিয়াছেন। দানখণ্ডের আরম্ভে রাধা, শ্যামের বাঁশী চুরি করিয়াছেন। কোন হেতু নাই, অমনই। ইহার পর নৌকাখণ্ডে, অবিকল চণ্ডীদাসের ভাব স্পষ্ট। তার পর কৃষ্ণ, গোপীদের ভার বহিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ও কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, চৈতন্যদেবের কালে রাঢ়ের পূর্বভাগে চণ্ডীদাসের কোন কোন অংশের বহুল প্রচার ছিল। রাধা মাথায় দধি দুগ্ধের পসরা লইয়া হাটে যাইতেন, ইহাতে বৈষ্ণবেরা দুঃখিত হইতেন না। হইলে দান ও নৌকালীলা গ্রহণ করিতেন না।

জয়ানন্দ মিশ্র তাঁহার "চৈতন্যমঙ্গলে" (সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত) লিখিয়াছেন (৩ পৃঃ), "জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥" ইহা জয়ানন্দের শোনা কথা নহে। তিনি যে চণ্ডীদাসের কোন কোন পদ পাইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ "চন্দ্রাবলী রাধা" (বৈরাগ্যখণ্ড, ৫৯ পৃঃ)। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমে দশ ক্রোশ দূরে আমাইপুরা নামে এক ছোট গ্রামে (বোধ হয়) ১৪২৭ শকে=১৫০৫ খৃষ্টাব্দে জয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল। তিনি চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন। ইহা হইতে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে "চন্দ্রাবলী রাধা" পাইতেছি। জয়ানন্দ চণ্ডীদাসের কিছু পদ পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ উপমা ও ভাষায় আছে।*

সুদূর পূর্ববঙ্গে ভবানন্দ চণ্ডীদাসের আ-ই-হ-ন নাম আ-ই-ম-ন করিয়াছেন। বোধ হয়, কোন রাঢিয় পুথীতে আইহন ছিল। আর, বড়ায়ি দূতী, কৃষ্ণের দানলীলা, যশোদার নিকট রাধার কৃত্রিম অভিযোগ, আকস্মিক কিম্বা ভবানন্দের নূতন কল্পিত নয়। ভবানন্দ চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা পাইয়াছিলেন এবং নিজে তাঁহার কল্পনায় গাঁথিয়া লইয়াছেন। চণ্ডীদাসের নিজের পালা পাইলে আরও সাদৃশ্য থাকিত।

গোপালদাস "শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" ১৫৯৫ শকে (১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে)† রচনা করেন। ইহাঁর পুত্র পীতাম্বর দাস "রসমঞ্জরী" লিখিয়াছিলেন। এই দুই পুস্তকে চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত হইতে না দেখিয়া ১৩৩৯ বঙ্গাব্দেব পরিষৎ-পত্রিকার ১৪৫ পৃষ্ঠে শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাঁরা " এমন কঠিন চণ্ডীদাসবর্জ্জনব্রত গ্রহণ কবিয়াছিলেন কেন ?" এই প্রশ্নে একটু ভুল হইয়াছে। "বর্জ্জন" বলিলে ইচ্ছা বুঝায়। আমরা ইচ্ছা জানি না। দেখিতেছি, নাই। অভাব পদার্থের কারণ অনুমান অসাধ্য। কেহ বলিতে পারেন, তাহাঁরা বড়ুর পদ পান নাই। চণ্ডীদাসের প্রতি গোপালদাসেব বিরাগ ছিল না, তিনি চণ্ডীদাসের নামিত পদ

* কবি প্রকারান্তরে জানাইযাছেন, যে শকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিযাছিলেন, সে শকে, ১৪০৭+২০= ১৪২৭ শকে তাহার জন্ম হইয়াছিল। নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমনকালে চৈতন্যদেব মান্দারণ হইতে আমাই-পুরা এবং সেখান হইতে বায়ড়া গিয়াছিলেন। মান্দারণেব নিকটে বাযড়া নামে গ্রাম আছে। মান্দারণের পূর্বে আরামবাগের নিকটে বায়ড়া নামে আর এক গ্রাম আছে। চারি শত বৎসর পুর্বে এটি বিখ্যাত ছিল। কিছু দক্ষিণে অভিরাম গোস্বামীর নিবাস ছিল। জয়ানন্দ এই গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

† লিপিকাল, ঢাকা মিউজিযমের পুথীতে "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম"। এই শকে "বুধযুক্ত কুহুতিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন"। ১৫৯৫ শকে দীপান্বিতা অমাবস্যা বুধবারে হইয়াছিল। বাঁকুড়ার এক পুথীতে সন আছে, "সন হাজার উনাশি জাবনী বৎসর। গ্রন্থ রচিল গোপালদাস ভিসকবর"॥ অতএব ১০৭৯ সনে=১৫৯৫ শকে।

তুলিয়াছেন। আর, চৈতন্যদেব যে কবির পদ আস্বাদন করিতেন, কোন্ বৈষ্ণব সে পদ বিস্বাদ বলিতে পারিতেন? গীতরসিক না হইলে কেহ ভাল ভাল নূতন নূতন গীতের সন্ধান রাখে না। পূর্ব্বরাঢ় হইতে তৎকালে লোকে বনাবচ্ছিন্ন দেশে আসে নাই। আসিলে বড়ুর পদ নিশ্চয় পাইতেন। এক কবি বড়ুর রাধা-বিরহের একটা পদ ("দেখিলোঁ প্রথম নিশী") এবং আর একটা পদ ("কেনা বাঁশী বাএ") নিশ্চয় পাইয়াছিলেন। অন্য দুই তিনটা পদে চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ অনুভূত হয়।

চণ্ডীদাসের পদ-প্রচারে দুই বাধা ঘটিয়াছিল। একটির উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা যাতাযাতের অভাব অপেক্ষা গুরুতর বাধা হইয়াছিলেন। দুই শত আড়াই শত বৎসর হইতে ইঁহারা গুরুর নাম লইয়া গুরুর আসনে চাপিয়া বসিয়াছেন, শ্রোতা কাচে ভুলিয়া হীরার অন্বেষণ করেন নাই। বড়ুর দান ও নৌকালীলা প্রসিদ্ধ ছিল, ভক্ত অনুকারক সে লীলাও যোগাইলেন। ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের নামিত সাড়ে নয় শত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঁকুড়ার এখানে ওখানে পুথিতে ও মুখে এমন পদ আরও আছে। *সে পদে 'দ্বিজ,' 'দীন' কিছুই নাই, চণ্ডীদাস এই নামটি আছে। এই নামের গুণে* সে পদ বিকাইয়াছিল। লোকে তিন অক্ষরের পদে মত্ত হইয়াছিল, কীর্ত্তনের সুরে দ্রব হইত। এই অবস্থায় কে চণ্ডীদাসের হাস, বিস্ময়, করুণ, ও শম রসের সন্ধান করে? যে ঠুংরীতে কান সাধিয়াছে, সে খেয়ালে রস পায় কি? বর্ত্তমান সমালোচনার দিনে আমরাও চণ্ডীদাস খুজি নাই। এখন দৈবাৎ পাইয়া সিআনা হইয়াছি, কিন্তু এই পর্যন্ত। আমার বিশ্বাস, মানভূমে খুজিলে বিষ্ণুপুরের খাতার মত খাতা পাওয়া যাইবে।

৯। কবির রাধাকৃষ্ণ

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" রাধাকৃষ্ণলীলা। এই লীলা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রজলীলা কবিকল্পিত। (১৩৪০ সালের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" 'ব্রজের কৃষ্ণ' পশ্য)। এই কল্পনার মূলে জ্যোতিষিক রূপক। রাসে রাধাকৃষ্ণলীলার পরিসমাপ্তি। ইহার পর ব্রজলীলা অসম্ভব।

বেদের ঋষিরা সূর্যে বিষ্ণু দেখিতেন। এক এক বিশেষ যোগে সূর্যের স্থিতি ধরিয়া বিষ্ণুর দুই এক অবতার স্বীকার করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়, লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যা-রূপ বিষ্ণুর অবতার মনে করিত। তখন মানব-শ্রীকৃষ্ণ ও সৌর-শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়া সূর্যের কর্ম মানবে আরোপিত হইল। বিষ্ণুর পালনী শক্তির নাম লক্ষ্মী। বিষ্ণু-রবি আকাশে থাকেন; বিষ্ণু-নারায়ণ। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীও সমুদ্র-সম্ভবা। আকাশের এক নাম সমুদ্র ছিল। অতএব স-শক্তি বিষ্ণু, লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তিতে দুই-ই আকাশে বা স্বর্গে। সৌর অর্থে শ্রীকৃষ্ণ রবি, কিন্তু লক্ষ্মী কই? লৌকিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, লক্ষ্মী কে? লক্ষ্মী অবশ্য কৃষ্ণের প্রিয়তমা। এক জ্যোতিষিক ঘটনার পর প্রিয়তমা বাস্তব হইয়াছেন।

সূর্য বর্ষে বর্ষে এবং চন্দ্র মাসে মাসে সপ্তবিংশ নক্ষত্র ভোগ করেন। যে রাত্রে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সে রাত্রি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সে রাত্রে সূর্য অবশ্য কৃত্তিকার বিপরীত দিকে বিশাখায় থাকেন। বিশাখানক্ষত্রের এক নাম রাধা ছিল। অতএব কার্ত্তিকী

পূর্ণিমায় সূর্য রাধার সহিত সঙ্গত হয়েন। বর্ষে বর্ষে এইরূপ হইতেছে। একদা, বহুপূর্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৩৮ অব্দে) কার্তিকী পূর্ণিমায় শরৎবিষুব হইত, এবং সে পূর্ণিমার পর নববর্ষ গণিত হইত। ব্রীহি (আউশ ধান) গৃহগত হইয়াছে, নবান্ন ভোজন হইয়াছে, রজনী কৌমুদী, লোকে নৃত্যগীতাদি উৎসব করিত। বালকবালিকারা মণ্ডলাকারে রাস নৃত্যগীত করিত। এই ঘটনা হইতে সৌর কৃষ্ণের প্রিয়তমা বিশাখা, এবং ব্রজগোপাল কৃষ্ণের প্রিয়তমা রাধা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিষুব দিন চিরকাল একই নক্ষত্রে ঘটে না। শরৎবিষুব কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে এক মাস পূর্বের আশ্বিনী পূর্ণিমায় আসিয়া পড়িল। তদবধি প্রায় ছয় শত বৎসর গত হইয়াছে। সে দিনেও লোকে রাত্রি জাগিয়া কোজাগর করিত, লক্ষ্মীপূজা ও নবান্ন করিত। আমরা এখনও সে স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। সে দিন হইতে কোথাও কোথাও নব বর্ষও গণিত হইত। বৃহদ্ধর্মপুরাণে আশ্বিন, বৎসরের প্রথম মাস। রাঢ়ের পূর্বাংশে পুরাণখানির উৎপত্তি। শাব্দিকেরা কৌমুদী শব্দের নূতন অর্থ আশ্বিনী পূর্ণিমা করিলেন। সবই ঠিক, কেবল রাধাকে (বিশাখাকে) পাইবার উপায় ছিল না। কারণ, আশ্বিন পূর্ণিমার দিন সূর্য চিত্রায় থাকেন। (চিত্রা, বিশাখা, অনুরাধা, নক্ষত্রপর্য্যায় এই।)

শরৎবিষুব হইতে লৌকিক বর্ষ গণিত হইত। বৈদিক যাজ্ঞিকেরা এই বর্ষারম্ভ মানিতেন না। তাঁহারা বেদের কালের অনুবন্ধে রবির উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি হইতে নূতন বর্ষ গণিতেন। তাঁহাদের বর্ষ আয়ন বর্ষ, লৌকিক বর্ষ বৈষুব। অয়নদিনে চন্দ্রসূর্য এক স্থানে থাকিতেন, সে রাত্রি অমাবস্যা। বিষুবদিনে চন্দ্রসূর্য বিপরীত স্থানে। সে রাত্রি পূর্ণিমা।

এখন দেখি, চণ্ডীদাস কি করিয়াছেন। কৃষ্ণ জানিতেন, তিনি নারায়ণ। কিন্তু রাধা জানিতেন না, তিনি লক্ষ্মী। জানিলে কাব্য সৃষ্টি হইতে পারিত না। কবি জানিতেন, কৃষ্ণ সূর্য। এক স্থানে (৩৬৩) কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুঁয়র, তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।" কশ্যপ ঋষি অদিতিকে বিবাহ করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের জনক হইয়াছিলেন। অন্য স্থানে (৩৩২), "সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে।" আর এক স্থানে (৩৪৬), "সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে।" কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পরে রাধার উক্তি। এটি দ্ব্যর্থ। রাধা বলিতেছেন, কৃষ্ণ এই ছিলেন, এই শূন্যে বিলীন হইলেন। অন্য অর্থে রাধা কৃষ্ণকে আকাশে যাইতে দেখিলেন। কবি নানা স্থানে এইরূপ শ্লেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-হারা হইয়া রাধা বড়ায়িকে নানা স্থানে "চাহিতে" বলিতেছেন, (৩৪০) শেষে "সাগরের ঘরে ভাগীরথী কূলে" খুজিতে বলিতেছেন। দুই-ই আকাশে। কৃষ্ণ যেখানেই যান, রাধার পিত্রালয়ে (ও শ্বশুরালয়ে) লুকাইতে যাইতেন না। সেখানে গেলে ধরা পড়িতেন।

শ্রীকৃষ্ণ মানব, রাধাও মানবী। যদি মানবী, তাঁহার পিতামাতা অবশ্য ছিলেন। রাধার পিতা সাগর। রাধা-বিশাখা নক্ষত্রের পিতা আকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সাগর যখন মানব, তখন তাঁহার নিবাস আছে। সে নিবাস ভাগীরথীকূলে, স্বর্গঙ্গার কূলে। এইটি ক্ষীরোদ সাগর। দেবাসুরে এই সাগর মথিত করিলে লক্ষ্মীর উদয় হইয়াছিল। দুই তিন স্থানে

(৬৮, ৬৯, ৭৭) কৃষ্ণ এ কথা বলিয়াছেন। "সুন্দরী রাধা ল সরূপ বোল মোরে। দেবাসুর মন্থোদধি মথিল কি তোবে ॥"

রাধার পিতা পাইলাম। মাতা কে ? লক্ষ্মীর মাতা লক্ষ্মী ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী সকলেই লক্ষ্মী। কবি রাধার মাতার নাম পদুমা, পদ্মা রাখিয়াছেন। পদ্মা লক্ষ্মীর এক নাম। (অমরকোষ)।

রাধার পতি কে ? রাধা বিশাখা নক্ষত্র। চন্দ্র অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের পতি, বিশাখারও পতি। কিন্তু কার্তিকী পূর্ণিমায় রবি বিশাখা ভোগ করেন। তারা-পতি চন্দ্র থাকিতেও রবি পতি হয়েন। রবি বিশাখার উপপতি, "বন্ধু" (৩৭৫)। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'বন্ধু' সম্বন্ধ, উপপতি সম্বন্ধ। এই 'বন্ধু' হইতে বঁধু)। বিশাখার পতি চন্দ্র। কবি উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি-দিনের চন্দ্রকে আনিয়াছেন। সে চন্দ্র আয়ন (অয়ন-সম্বন্ধী)। দুই কারণে এই চন্দ্র নিষ্ফল। উত্তরায়ণ-দিনে অমাবস্যা, চন্দ্র অদৃশ্য। লোকে সে দিন রাসোৎসব করিত না, নববর্ষপ্রবেশ স্বীকার করিত না। এইটি 'দৈবযোগ'। অতএব আয়ন-চন্দ্র নপুংসক। বিশেষতঃ চন্দ্রের সম্মুখে রবি রাধার সহিত প্রেমলীলা করিতেছে, চন্দ্র একটা কথাও বলিতেছে না। কৃষ্ণ বলিয়াছেন (২৭৮), "মারিবোঁ আইহন বীর," (২৮০) "মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।" কৃষ্ণের এই সদর্প উদ্ধত উক্তির লৌকিক অর্থ কি ? "পাপিআ কাহ্নাঞি" মাউলানীকে বিধবা করিয়া পাপের ভরা পূর্ণ করিবেন ? মাতুল বধ তাঁহার কপালে লিখিত ছিল ইহারই বা কি অর্থ ? জ্যোতিষিক রূপকে ইহার অর্থ আছে। আইহন, আয়ন চন্দ্র। আয়ন চন্দ্র অমাবস্যায় রবিতেজে হত, অদৃশ্য। ইহার সহিত কংসবধ তুলনা করা যাইতে পারে। কংস দৈবকীর সহোদর, আইহন যশোদার সহোদর, কৃষ্ণের সোদর মাউলা, এবং রাধা সোদর মাউলানী। মামা বধে এই শ্লেষ আছে। নপুংসক হইলেও আইহন "বীর" ও "দুর্বার"। বীর না হইলে চন্দ্র শূন্যে বিচরণ করিতে পারিত না। কে বা তাহার গতি রোধ করিতে পারে ?

কবি রাধার বিশেষণ চন্দ্রাবলী রাখিয়াছেন। আবলী, পংক্তি। চন্দ্রাবলী, যে নক্ষত্র-পংক্তির স্বামী চন্দ্র। বিশাখার প্রাধান্য হেতু রাধা একাই আবলী নাম পাইয়াছেন। চন্দ্রাবলী রাধা, চন্দ্রের সপ্তবিংশ পত্নীর আবলীর রাধা। এই অর্থও করা যাইতে পারে। সে রাধা অবশ্য কমলা নয়।

কৃষ্ণের দূতী বড়ায়ি, বড-আয়ী। পিতামহী ও মাতামহী, দুই-ই আয়ী। এখানে আয়ী, পিতামহী। বড় আয়ী পিতৃব্যের মাতা নহে।* অতএব রাধার বড়-আয়ী সাগরের মাতা এবং পদুমার শাশুড়ী। শাশুড়ী (বড়ায়ি) রাধাকে বলিতেছেন, (২৯৯) "দুচারিণী যার মা তার হেন গতী", রাধা, তোর মা পদুমা অসতী, তুই তার বেটী, তোরও গতি সেইরূপ। বড-আয়ী মাতামহী হইলে এই গালি নিজের প্রতি হইত। বড়ায়ি তাঁহার বহুকে গালি দিতেছেন। গালি মিথ্যা ওজনয়। বহুটী কমলা চঞ্চলা।

---

* বড়াই বানান অশুদ্ধ। কারণ, উচ্চারণে আয়ী। আমি বাল্যকালে আয়ী জানিতাম, দিদিমা জানিতাম না। মুঙ্গুড়া-নিবাসী কনৌজ ব্রাহ্মণেরা 'বড় আজী' বলেন।

রূপক সম্প্রসারণ সমীচীন নয়। তথাপি মনে হয়, কৃষ্ণের ভারিআ-রূপ সে জ্যোতিষিক রূপক হইতে আসিয়াছে। শরৎ কাল, রৌদ্র তত প্রখর নয়। রাধা গ্রীষ্মকালেও দধি-দুগ্ধের পসরা মাথায় বহিতে পারিয়াছিলেন, ভারী ডাকেন নাই। কিন্তু শরতের রৌদ্র খর বোধ করিলেন। বোধ হয়, সে দিন কার্তিকী পূর্ণিমা, রবি বিশাখায়। বিশাখা নক্ষত্রে দুইটি তারা তুলাদণ্ডের অথবা বাঁহুকের আকারে অবস্থিত। (এই হেতু রাশির নাম তুলা।) কৃষ্ণ রাধার ভার কাঁধে করিলে স্বর্লোকে দেবগণ খল-খলি হাসিয়াছিলেন। হাসিবার কথা বটে। কারণ, কৃষ্ণ প্রকারান্তরে রাধাকে স্কন্ধে বহিয়াছিলেন। রাধা বলিয়াছিলেন, কোন্ গোপ ভার বহে না, তোর এত লজ্জা কিসের? কৃষ্ণ উত্তর দেন নাই, কিন্তু অপমান বোধ করিয়াছিলেন। নারীকে স্কন্ধে বহন, ইহাই কারণ।

কবি বৃন্দাবন-লীলা গাহিয়াছেন। অন্যে মথুরাতেও জ্যোতিষিক রূপক দেখিয়াছিলেন। রবি এক এক নক্ষত্রে ১৩.১৪ দিন থাকেন। বিশাখায় থাকিয়া অনুরাধায় গমন করেন। অনুরাধা নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশে মানুষী কল্পনা করিলে একটা তারায় পৃষ্ঠে কুব্জ দেখা যাইবে। ভাগবতে কৃষ্ণ ত্রিবক্রার, এবং হরিবংশে কুব্জার আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোন প্রেমলীলা করেন নাই। ত্রৈলোক্য-সুন্দরী রাধা আর কোথাও ছিল না। ভাগবত পুরাণ ও হরিবংশ লোক হাসাইয়াছেন।

এক বসন্তে, বৈশাখ মাসে, কৃষ্ণ (কবির বসন্ত চৈত্র বৈশাখ, ১৭ চৈত্র বিষুব হইত) মথুরায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বড়ায়ির হাতে ধরিয়া বলিয়া গেলেন, (৩৮৪) "তাক রাখিহ যতনে।" পুনর্মিলনের ইচ্ছা না থাকিলে কৃষ্ণ এই মিনতি করিতেন না। বড়ায়ি বিরহকাতরা রাধাকে প্রবোধ দিতেছেন, (৩৯১) "পাছে কাহ্নায়িক আনী দিবোঁ তোর থানে।" বড়ায়িই বা এ কথা বলেন কেন? কিন্তু দিন যাইতে লাগিল, রাধা মাস গণিতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন গেল, কাহ্নায়ির দেখা নাই। বড়ায়ি মথুরায় কৃষ্ণের লাগ পাইলেন, কৃষ্ণ পুরাণা গান ধরিলেন, সে গান অনেক বার শোনা গিয়াছে। রসিক কবি বিরহের পর মিলন বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। পুনর্মিলনের দিনও উপসন্ন, কার্তিক মাস পড়িয়াছিল। (কৃ-পুথীতে শেষের পাতা নাই। না থাকিলেও বলিতে পারি, মিলন হইয়াছিল।)

এই যে কার্তিকী পূর্ণিমায় মিলন, এইটি অন্য কবির রাস-স্থানীয়। পশ্চিমদেশে রাস-নৃত্য দূষ্য বিবেচিত হইত না। বঙ্গদেশে কুলনারীর নৃত্যগীত কোন গ্রন্থে পাই নাই। কবি নাচুনীকে গণিকা মনে করিতেন (২৪২)। রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু রাসের নামগন্ধ করেন নাই। তাঁহার কালে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) রাসোৎসব থাকিলে তিনি নিশ্চয় ব্যবস্থা লিখিতেন। কবি বৃন্দাবনখণ্ডে "বৃন্দাবন-বিলাস" লিখিয়াছেন, রাস লেখেন নাই। যখন রাস নয়, তখন দিবারাস ও রাত্রিরাসের তর্ক উঠিতে পারে না। এক বসন্তে এই বিলাস হইয়াছিল, পরবৎসর শরতেও এইরূপ বিলাস হইয়া থাকিবে। মাধবাচার্য ও দ্বিজ চণ্ডীদাস শরৎরাস বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সেটা রাস নয়, বিলাস।

জয়দেব বসন্তরাস গাহিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার পূজারি গোস্বামী স্মরণ করাইয়াছেন, প্রথম রাস শারদীয় পূর্ণিমায় হইয়াছিল। বসন্ত-রাসটি মদনোৎসব। চৈত্র-শুক্লচতুর্দশী মদনচতুর্দশী

নামে বহুপূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সে দিনে রাস আনিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী "বিদগ্ধমাধবে" পৌর্ণমাসীকে দূতী করিয়াছেন, যেন পূর্ণিমারজনী রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াছিল। তিনি জানিতেন, রাধা, বিশাখা। কিন্তু চৈত্র মাসে। টীকাকার ফাঁপরে পড়িয়াছেন, চৈত্র-পূর্ণিমায় রবি অশ্বিনীতে থাকেন। চন্দ্রও বিশাখায় থাকে না, চিত্রায় থাকে। গোস্বামী কবি রূপক বুঝিতে পারেন নাই, 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' করিয়াছেন। ইনিই রাধার স্বামীর নাম অভিমন্যু রাখিয়াছেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব গোস্বামিঠাকুরের প্রদত্ত নাম স্বীকার করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "নিগূঢ়তত্ত্বসার" পুথীতে আছে, রাধার প্রতি,—

আয়নভবনে তার অভিমন্যুহুতে।
তার সঙ্গে মিলন হইব তোর সাথে ॥

এখানে আয়নের পুত্র অভিমন্যু। আ-য়-ন নামটি চিন্তনীয়। কবিরাজ গোস্বামী আয়নের স্ত্রীর নাম জটিলা, কন্যার নাম কুটিলা রাখিয়াছেন। এই সব কবি-কল্পিত নাম দ্বারা চণ্ডীদাসের অপূর্ব রূপক কাব্য বুঝিতে পারা যাইবে না, পদে পদে ঠেকিতে হইবে।

কবির কাব্যের দোষ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণের দুই অর্থ করিয়াছেন। এক অর্থে, রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মী-নারায়ণ, অপর অর্থে, বিশাখা-রবি। কবি দুই অর্থ মিশাইয়া কাব্যের অনৌচিত্য-দোষ ঘটাইয়াছেন। কৃষ্ণ বারম্বার বলিতেছেন, তিনি দেব চক্রপাণি, অসুর-দলন হরি। রাধার বিশ্বাস হইতেছে না, কেনই বা হইবে? যিনি অসুর-দলন হরি, তিনি গোরুর রাখালি করিবেন কেন? যদি রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ হন, তাহা হইলে রূপকটি ব্যর্থ। আর, যদি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপক না হয়, তাহা হইলে কবি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের নায়ক ব্যভিচার করিতেছেন, সে পর-নারী যে-সে নহে, সোদর মাউলানী। রাধা সত্য মাউলানী না হইলেও পরস্ত্রী। এই ধর্মবিরুদ্ধ সমাজবিধ্বংসী কাব্য পুড়াইয়া ফেলা উচিত। কবির কৃষ্ণ একটা অসুরও বিনাশ করেন নাই, কেবল মুখে বড়াই করিয়াছেন। কাব্যে সে উদ্দেশ্য গৌণ ও প্রচ্ছন্ন, রস-সম্ভোগই মুখ্য ও ব্যক্ত। এই কর্ম দেখিয়াই কাব্যের বিচার করিতে হইবে। কবি দুই কুল রাখিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তিনি দাঁড়াটি করেন নাই। একটা পাইয়াছিলেন, সেটা নিজের ভাবনায় ফেলিয়া নূতন আকারে গড়িয়াছেন। "নারায়ণ সকল ঘটে বর্তমান, তাঁহার ব্যভিচার কি?" এখানে সে তর্ক চলিবে না। কবি অধ্যাত্মতত্ত্ব লেখেন নাই।

১০। কৃ-পুথীর পদ এক কবির নয়

কৃ-কীতে ৪৩০টি পদ আছে, তের খণ্ডে সাজানা। জয়দেব প্রথমে শ্লোক দিয়া পরে গীত গাহিয়াছেন। কৃ-কীতেও সেই রীতি। পরবর্তী কালে সংস্কৃত শ্লোকের পরিবর্তে 'কথা দিশা' দেওয়া হইত। এই দুই লক্ষণ দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কৃ-কীর পদ এক কবির রচিত ও সজ্জিত।

কিন্তু পদের বস্তু, ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করিলে দৃষ্টিভ্রম বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, কবির বহুকাল পরে কেহ তৎকালে শ্রুত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া কৃ-পুথীর মাতৃকা লিখিয়াছিলেন। এই যে দিন ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের নামিত যে সব পদ পাইয়াছিলেন, সে সব এক

এক পালায় সাজাইয়া "চণ্ডীদাসের পদাবলী" নাম দিয়াছেন। যিনি ভূমিকা না পড়িবেন, তাঁহার মনে হইবে, "পদাবলী" এক কবির রচিত ও গ্রথিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত পদের ভাষাও পরিবর্তন করিয়াছেন। কৃ-পুথীর সংস্কর্তা ভাষা সর্বত্র শুদ্ধ করেন নাই। এই কারণে পদের মিশাল ধরা সোজা হইয়াছে।

১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে কবি গীত রচিয়াছিলেন। মানভূম হইতে সে গীত বিষ্ণুপুর দিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। নানা গায়কে গাহিয়াছিল, পদের ভাষা স্ব স্ব দেশের ও কালের উপযোগী করিয়াছিল, নিজেরা গীত রচিয়া পালা বাড়াইয়াছিল। যাবতীয় গীতিকাব্যের এই দশা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা কাব্যের প্রচার রক্ষা করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর পূর্বে কৃ-পুথীর পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে ভাষা অনেকাংশে পুরাতন রহিয়া গিয়াছে। সে সকল পদ মানভূম হইতে পূর্বদিকে দামোদর পর্যন্ত দেশে প্রচলিত ছিল, এই কারণেও ভাষা পুরাতন রহিয়াছে। "বিষ্ণুপুরের খাতায়" দেখিতেছি, কৃ পুথী আদি ও অকৃত্রিম নয়, এক শত দেড় শত বৎসর পূর্বেও কৃ-পুথীর অতিরিক্ত পদ ছিল, কৃ-পুথীর অশুদ্ধ পদের স্থানে শুদ্ধ পদ ছিল। মনে রাখিতে হইবে, পুরাতনের পুরাতন আছে, 'প্রাচীন' 'প্রাচীন' রব তুলিলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হইবে না। এখানে বিষয়টির সম্যক্ আলোচনার স্থান হইবে না। দুই একটা দুই একটা হেতু দেখাইয়া উপরের উক্তি সমর্থন করিতেছি।

(১) প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক দেখি। পদসংখ্যা ৪১০, কিন্তু শ্লোকসংখ্যা ১২৫। শ্লোকে পদের সার মর্ম। যদি তাহাই হয়, একই মর্মের হারাহারি ৩টা পদ রচিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহা নাই। কতকগুলি গীতের মর্মজ্ঞাপক শ্লোকের অভাব আছে। কোন পদ-সংগ্রাহক ক্রমভঙ্গ ও বন্ধভঙ্গ করেন না। জন্মখণ্ডের শেষে (৮পৃঃ) দুইটি শ্লোক বসিয়াছে, স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। দুই স্থানে দুইট শ্লোক থাকিলে ক্রমভঙ্গ হইত না। নৌকাখণ্ডের শেষে (১৬৬পৃঃ) দুইটি শ্লোক আছে। তাহার অর্থ, (নৌকা লীলার পর) রাধা ঘরে ফিরিয়া অভিমন্যুকে যমুনা-পারের ক্লেশ বলিলেন। অভিমন্যু মোহবশে বলিলেন, আর মথুরা যাইয়া কাজ নাই। এই নিষেধ পাইয়া রাধা বর্ষাকালটি' ঘরে বসিয়া তক্রাদি বেচিতে লাগিলেন। এখানে শ্লোককর্তা নিজেকে ধরা দিয়াছেন। তিনি কবির ভাবনায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কবির স্কন্ধে নিজের রসাজ্ঞতার ভার চাপাইয়াছেন। বোধ হয়, শ্লোককর্তা গায়নকে শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "গায়ন ঠাকুর, একদিনের নৌকা-লীলা শোনালেন; পরদিন কি হয়েছিল?" অ-কবি গায়ন উত্তর করিলেন, রাধা আর যমুনাপার হয়েন নাই, তিনি ঘরে বসিয়া দই দুধ বেচিতে লাগিলেন। শ্রোতাও নির্ব্বোধ, ধরিলেন না, গোকুলে কেবল গোপের বাস ছিল, সকলের ঘরেই দই দুধ ছিল, রাধার দই দুধ কে কিনিত? যদি সে উপায় ছিল, রাধা কেন অকারণ মাথায় পসরা বহিয়া দূরে মথুরার হাটে যাইতেন? শ্রোতা আরও তর্ক করিতে পারিত। রাধার শাশুড়ী ঘরের গিন্নী। তিনিই রাধাকে হাটে পাঠাইতেন, কড়ি গণিয়া লইতেন। রাধা শাশুড়ীকে পথক্লেশ না জানাইয়া স্বামীকে জানাইলেন? এ কেমন কথা? আইহন দুর্বার বটে, কিন্তু মায়ের আজ্ঞাধীন ছিল, দুই বৎসরের মধ্যে এক দিনও নিজে ঘরের কর্তা হয় নাই। আরও দেখিতেছি, এই একটিবার স্বামীর সহিত রাধার কথা হইয়াছিল। শ্লোককর্তা ভাবেন নাই,

কোনও প্রধান লীলা একাধিক দিন হয় নাই। তাহাঁর কাব্যরসবোধ থাকিলে ইহার হেতু বুঝিতে পারিতেন। ইনিই অভিমন্যু নামটি "বিদগ্ধমাধব" হইতে লইয়াছেন। ইনিই বড় আয়ীকে "জরতী" বুড়ী নামে চালাইয়াছেন, দূতীকর্মে বড় আয়ীর প্রয়োজন বুঝিতে পারেন নাই। বুড়ী হইলেই দূতী হইতে পারে না। আর্যিকা হওয়াতেই বড় আয়ীর দৌত্য সফল হইয়াছিল।

(২) তাম্বূলখণ্ডে রাধা, কৃষ্ণের অপমান করিয়াছেন, "বড়ায়ি ল। কদমের তলে বসী" ইতি পদে (২৮) কৃষ্ণ প্রতিশোধ নিরূপণ করিতেছেন। তিনি (১) দান সাধিবেন, (২) রাধার হার কাড়িয়া লইবেন, (৩) বৃন্দাবনে বিহার করিবেন, (৪) রাধাকে মদনবাণ মারিবেন। যে গায়ন কাব্যের এই অনুক্রমণিকা করিয়াছিলেন, তিনি কি জানিতেন না, কৃষ্ণ রাধাকে বিরহানলে দগ্ধ করিবেন? তাহাঁর পুথীতে কি বিরহের পৃথক্ খণ্ড ছিল না? কাব্যটি ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত; দ্বাদশ নয়, চতুর্দশ নয়। সংখ্যাটি অযুগ্ম; অসাধারণ মনে হইতেছে। সন্দেহের অপর হেতু আছে। (১) কৃ-কীতে বিরহপালা দুই বার আছে: প্রথম বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। এইখানেই বৃন্দাবনলীলা শেষ হইবার কথা। কংসবধ বলিতেই হইবে, এমন নির্বন্ধ ছিল না। (২) বিরহখণ্ডের ভাষায় বিশেষ আছে। ঞ অনুনাসিক ইহার প্রধান লক্ষণ। অনন্তরার্থে ঞা, ইঞা এই খণ্ডে আছে, অপরাপর খণ্ডে আঁা, ইআঁ আছে। অন্য কয়েকটা শব্দের বানানেও বিশেষ আছে। শব্দের রূপেও প্রভেদ আছে। বোধ হয়, রাধাবিরহখণ্ড ছোট ছিল, এক গায়ন পালাটি বাড়াইয়াছিলেন। দুই গায়নের দুই পালা একত্র করিয়া কৃ-কীর বিরহখণ্ড হইয়াছে।

(৩) কৃ-কীতে ৪৩০টি পদ আছে। তন্মধ্যে দানখণ্ডেই ১১১টা। পুথীর কয়েক পাতা পাওয়া যায় নাই। সে পাতা থাকিলে বোধ হয়, ১২০টা পদ হইত। বস্তু জটিল, ও বিচিত্র নয়। এক কবির পক্ষে এত পদ রচনা দুষ্কর মনে হয়। বিরহখণ্ডের পদগুলির একটি দুইটি পড়িলে কবিত্বে মুগ্ধ হই, কিন্তু সব পড়িলে মনে হয়, এক কবির রচিত নয়, পদের ভাবে চমৎকারিত্ব খর্ব হয়। কেহ কেহ যৎসামান্য বিষয়ে বহু পদ রচনায় কবির গুণপণা মনে করিতে পারেন। কিন্তু বোধ হয়, কোন উত্তম কবি পদবাহুল্যকে গুণ স্বীকার করেন না। এক ভাবের গীত পরে পরে শুনিতে ভাল লাগে না। কৃ-কীতে স্থানে স্থানে এই দোষ আছে। রাধা-কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। গ্রাম্য শ্রোতা এইরূপ গীতে হৃষ্ট হয়, গায়ন নূতন নূতন গীত রচিয়া শ্রোতার মনস্তুষ্টি করেন। এক এক গায়ন মূল কবির তুল্য পদ রচনা করিতে পারিতেন।

(৪) কবির উপাধি বড়ু। তিনি বাসলীচরণ বন্দিয়া পদ সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা সকল পদেই বড়ু ও বাসলী নাম পাইতে আশা করি। কারণ, আমরা স্বীকার করি, উত্তম কবি ক্রমভঙ্গ করেন না। কিন্তু (ক) "এথাঁ আণ সন্ধে" ইতি পদে (১৯৯) বাসলী-বন্দনা নাই। পদটি বৃন্দাবন খণ্ডের আরম্ভে আছে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। (খ) "যতন করিআঁ রাধা" ইতি পদে (১৮৬) বাসলী-বন্দনা আছে। কিন্তু কবির বিশেষণ 'বড়ু' শব্দ নাই। কৃষ্ণ ভার বহিতেছেন, বাটে নারদ দেখিয়া

রাধাকে ভর্ৎসনা করিলেন ; রাধা গ্রাহ্য করিলেন না, কৃষ্ণও ভার নামাইলেন না। এমন অনাবশ্যক অসঙ্গত পদ কবির হইতে পারে না। বড়ু নাই, বাসলী নাই, এমন পদও কৃ-কীতে প্রবেশ করিয়াছে।

(৫) কোন উত্তম কবি ভাবের অসঙ্গতি করেন না। (ক) তাম্বুলখণ্ডে "আল। দূতী অপমান কৈল" ইতি পদে (২৬) কৃষ্ণ অপমানের বার্তা না শুনিয়াই তর্জন করিয়াছেন, পরবর্তী পদে সে বার্তা আছে। উক্ত পদের "ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা" অর্থহীন। কারণ, তখন নেহা হয় নাই, ভাঙ্গেও নাই। (খ) বৃন্দাবন-বিলাসের পর রাধা মানিনী, কৃষ্ণ "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ" (২১৭), কবিত্ব করিয়াই পরের পদে রাধাকে ভয় দেখাইতেছেন, "বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী।" এ যে বর্ষা, পরে বজ্রপাত। কবির কৃষ্ণ গোঙার। তিনি বুঝিতেন, বামাজাতি বলদ্বারা বশীভূত হয়। সংস্কৃত শ্লোক এই পদের উপরে আছে, কবিত্বের উপরে নাই। তিনিই কবিত্ব করিয়াছিলেন ? (গ) কৃষ্ণ গোঙার হইলেও মামীকে ছিনারী বলিতে পারিতেন না। সম্বন্ধের বাধা না মানিলেও নিজের মানে বাধা দিত। রাধাকে ছিনারী বলা, আর নিজেকে লম্পট স্বীকার করা একই।

(৬) কোন কবি দুই স্থানে দ্বিবিধ উক্তি করেন না।

(ক) (১৭৫ পৃঃ) সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে ॥
কিন্তু (৯৫ পৃঃ) পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।
সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে ॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুঈ আসুরে।
তাহারো পরাণ লঅাঁ নিলোঁ যমপুরে ॥

প্রথম পদটি কবির। তিনি বিষ্ণুপুরাণ পড়িয়াছিলেন, কোন্‌টা অসুর, কোন্‌টা নয়, তাহা চিনিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পদটি এক গায়নের। ইনি শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণ অসুরবধ করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শকট ও তরুও অসুর। কিন্তু এই দুই অসুর কৃষ্ণের অনিষ্ট করে নাই। উক্ত দুই পদের ভাষাও দ্রষ্টব্য। মোএঁ স্থানে আহ্মে কিম্বা মোঞে লিখিলে ছন্দের দোষ হইত না। তা-হা-রো বিস্ময়জনক। (অমুক পুরাণে যমলার্জ্জুন শাপভ্রষ্ট অসুর। এই ব্যাখ্যা দ্বারা দুই উক্তির ঐক্য হইবে না)।

(খ) কবির বৃন্দাবন যমুনার কোন্ পারে ? পুরাণে আছে, গোকুলে উৎপাত হইতে দেখিয়া, নন্দাদি গোপ গোকুল ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবনের নিকটে উপনিবেশ করেন। পাশে যমুনা। এখানে যমুনা উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিতেছে। বৃন্দাবন যমুনার পূর্বপারে। মথুরা পশ্চিম পারে, উত্তরে। দানখণ্ডে পাইতেছি, বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া উত্তরদিকে পথ ছিল। কতক দূর যাইয়া, যমুনা পার হইয়া, মথুরার পথ ধরিতে হইত। বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া আর একটা পথ ছিল। সে পথে যমুনার খেয়া-ঘাট। নৌকাখণ্ডে এই পথ স্পষ্ট।

কিন্তু বাণখণ্ডে বৃন্দাবন যমুনার পশ্চিম পারে।

(২৭১ পৃঃ) কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥

তথাহি বংশীখণ্ডে,—

(২৯৬ পৃঃ) যমুনা নদীতে কেমনে হৈবোঁ পার।

অপিচ বিরহখণ্ডে,—

(৩৩৮ পৃঃ) কেমনে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে।
যমুনা বহে পবতর ধার॥

এই বিরোধের এক সমাধান আছে। যমুনার দুই পারেই বৃন্দাবন ছিল। যথা, কালিয়দমন খণ্ডে,—

(২০১ পৃঃ) "বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে।"

কিন্তু ইহা দ্বারা দুই কুল রক্ষা হয় না।

(৭) শব্দ দেখি। সংস্কৃত হইতে বিকৃত শব্দ যখন যে দেশে যেটা চলে, তখন সেটাই চলে। একই দ্রব্যের দুই তিন নাম হয় না।

(ক) কিন্তু বৃন্দাবনে দেখিতেছি, ভাঁটি ভাণ্টি, আম্বু আম্ব, ছাতীঅন ছাঞিঁয়ন, আর্জ্জুন কুহুম, এক এক গাছের দুই দুই নাম। কেবল তাহাই নহে, একই পদে একই গাছের একই নাম দুই বার আছে। মহুল, এই নাম দুই স্থানে দুই বার। আরও আশ্চর্যের কথা, বৃন্দাবনে যে গাছের নাম অগথ (অগস্ত্য), কৃ-কীর অন্যত্র সে গাছের নাম বগহুল (বকফুল)।

(খ) অন্য শব্দেও দুই কবি বা গায়নের কর্ম স্পষ্ট। মাউলানী মামী, দৌড়ী দড়ী, কৌড়ী কড়ি, ডাড়িম্ব ডালিম ইত্যাদি। ওড়িয়াতে মউলানী দৌডী কৌড়ী দাড়িম্ব। কোন ওড়িয়ার মুখে অন্য নাম বাহির হইবে না, কেহ মামী বুঝিবে না।

(গ) বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশী নামও আসে। কৃ-কীতে গুলাল, খবমুজা আসা আশ্চর্য নয়। কিন্তু দেশী দ্রব্যের দেশী নাম থাকিলে বিদেশী নাম অল্প কালে প্রচলিত হয় না। এ বিষয়ে একালের সহিত সেকালের তুলনা চলিবে না। কৃ-কীতে ধনু অর্থে কামান শব্দ এক স্থানে আছে (৬ পৃঃ), ধনু যুদ্ধাস্ত্র; কামধনু শব্দের সাদৃশ্যে ভ্রূ-কামান এই উপমা আসিতে পারে। কুত-ঘাট শব্দের কুত অর্থে শুল্ক। শব্দটি যাবনিক। কুত-ঘাটের দেশী নাম 'কর-কুলআ ঘাট' (১০৫ পৃঃ) কৃ-কীতেই আছে। যাবনিক বা-কী দুই স্থানে আছে। দুই স্থানই দানখণ্ডে। মজুরি, মজুরিআ শব্দ আরও বিস্ময়কর। কবির দেশ ও কাল মনে রাখিয়া এই সকল শব্দের প্রবেশ চিন্তা করিতে হইবে। রাঢ়ের উত্তর ও পূর্বাংশে মুসলমান অধিকার হইয়াছিল, যাবনিক শব্দও প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে কবি কৃ-কী রচিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্ব দেড় শত বৎসরের মধ্যে মানভূম ও বিষ্ণুপুর মুসলমান-অধিকারে আসে নাই, অধিকৃত দেশের সংসর্গেও আসে নাই। তখনও রাজকর আদায় হইত, বাকিও পড়িত, ভারীও কাঁধে ভার বহিত। প্রথমে মজুর শব্দ আসিয়াছিল। পরে তাহার কর্ম মজুরি, যে করে, সে মজুরিআ। এই দুই বাঙ্গালা শব্দ রচিত ও প্রচলিত হইতে অন্ততঃ এক শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। ভারীকে মজুর বলাও ঠিক হয় নাই। মাধবাচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস তাঁহার "কৃষ্ণমঙ্গলে" কবির ভারখণ্ড লইয়াছেন, কিন্তু মজুরিআ লেখেন নাই। কবির দেড় শত বৎসর পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণকে মজুরিয়া খুঁজিতে হইয়াছিল, দাফর মিঞা পাচ হাজার বেরুণীএল আনিয়াছিল। তাহার দুর্বলা দাসী

'ভারী' লইয়া হাটে গিয়াছিল, বেবনিয়া ভার বহে নাই। অদ্যাপি বাঁকুড়ায় বেরণ দুষ্প্রাপ্য নয়। ছাতনা ও বাঁকুড়ায় বর্তমানে চলিত নাম, মুনিষ। মজুরিআ কোথায় গেল? ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কবির দেশে যাবনিক শব্দ একটীও থাকিবার কথা নয়। আর, কৃ-পুথীর কাল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে না আনিলে কুত-ঘাট, বাকি ও মজুরিআ পাওয়া দুষ্কর। বোধ হয়, শব্দগুলি রাজা মানসিংহের পরে ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) একই ধাতুর দুই রূপই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? সজ সাজ, বা বাজা বিকণ বিক, ভ হ, কাঞ্চুলী ভাঙ্গা কাঞ্চুলী চেরা, ইত্যাদি।

(৮) যদি মনে করি, যে সময়ে পুবাতন রূপ হইতে নূতন রূপে ধাতু আসিতেছিল, কবি সে সময়ে লিখিয়াছিলেন, সে ব্যাখ্যা বিভক্তি-প্রত্যয়ের অনিয়মে নিষ্ফল। একটা দেখি। স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃপদের ইল বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদে ইলী রূপ কৃ-কীর এক বিশেষ। যেমন, ৯ পৃঃ—

বকুল তলাত গোআলী।
বড়াযিব পন্থ নেহালী॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়াযি চলিলী আন পথে॥

কিন্তু অনেক স্থলে ইলী স্থলে ইলা হইয়াছে। পরিবর্তনটি যৎসামান্য নয়। ভাষার এক মর্মে আঘাত। বর্তমানে ইহার কোন চিহ্ন পাই না। ইলী বিভক্তি কবির প্রাচীনতার এক বিশেষ প্রমাণ। কর্তৃকারকে 'এ' বা 'এঁ', কর্মকারকে 'ক' চণ্ডীদাসের ভাষা। কিন্তু বহু বহু স্থলে 'এ' নাই, 'ক' স্থলে 'কে' হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তন ঘটিতে অন্ততঃ দুই শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। এখনও ছাতনা ও বাঁকুড়ার সাধারণ লোকে আমাক (আমাকে), তোমাক (তোমাকে) বলে।

(৯) অনন্ত নামক এক গায়নেব সাতটি পদ কৃ-পুথীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাযিল।" ইহার সোজা অর্থ, 'বড়ু চণ্ডীদাস' উপাধি হইয়া গিয়াছিল। নানা কবি সে উপাধি গ্রহণ করিয়া পদ রচিয়াছিলেন, তাহাঁদের মধ্যে একজনের নাম অনন্ত ছিল। ইনি বড়ুর নামে আত্মগোপন না করিয়া অমরত্বের অংশী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বিতর্ক করিয়াছেন, যেহেতু কবি চণ্ডীর দাস ছিলেন, সে হেতু 'চণ্ডীদাস' নামটি উপাধি। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে হেতু তাহাঁর নাম অনন্ত হইতে পারে না। ৪৩০টি পদের ৭টি পদে অনন্ত নাম পাইতেছি। দানখণ্ডে ৩, বৃন্দাবনখণ্ডে ১, বংশীখণ্ডে ১, বিরহখণ্ডে ২। গায়নেরা মূল কবির কাব্যে এই রীতিতে দুই দশটি পদ প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। অপর দিকে কবির জন্মের ১৪০ বৎসর পরে রচিত "বাসলী-মাহাত্ম্যে" দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই নাম পাইতেছি। দুই জনই দেবীর দাস ছিলেন। দুই জনেরই পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল? সে বিতর্ক উহতেও পরিণত হয় না, সেটা নিষ্ফল।

(১০) প্রথমে কবিব দেশের গায়নেরা তাহাঁর পদ গাইতেন, কাল ও দেশান্তরে কবির ভাষার অল্প স্বল্প রূপান্তব কবিতেন, শ্রোতার মতি বুঝিয়া নূতন পদ গাঁথিয়া দিতেন। এই ভাবে অনেক বৎসব গিয়াছিল। পরে এক গীত-রসিক খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দুই গায়নের দুই পুথী পাইয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র,- অপরটি এ। ক্ষুদ্র পুথী বৃহৎ।

ইহাতে বংশীখণ্ড পর্যন্ত ছিল। ঞা পুথী ছোট, কেবল বিরহখণ্ড ছিল। তার পর আর এক গায়ন জয়দেবের অনুকরণে গীতের আদ্যে সংস্কৃত শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন। ইহাঁর পরেও আর এক সংগ্রাহক আর কতকগুলি পদ পাইয়াছিলেন। তিনি 'চণ্ডীদাস' এই নামে ভুলিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের বিশেষণ বড়ু ও বাসলীগণ আছে কি না, তাহা দেখেন নাই। এইরূপে কৃ-পুথীর মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছিল।

আরও বোধ হয়, ঞা পুথী বিষ্ণুপুরের পূর্বাংশে ও পূর্ব-দক্ষিণাংশে প্রচলিত ছিল। পূর্ব-দক্ষিণাংশে জয়ানন্দের নিবাস ছিল। তাহাঁর "চৈতন্যমঙ্গলে" লঞা, পাঞা পাইতেছি। করিঞা বুঝিতে পারি, কিন্তু কৃ-কীর লঞা, হঞা, খাঞা, পাঞা ইত্যাদি লিপিকর-প্রমাদ মনে হয় না। কৃ-কীতে আর এক নিদর্শন পাইতেছি। রাধা, কৃষ্ণের বাঁশীর নাদ শুনিয়া রন্ধনের যুক্তি ভুলিয়া গেলেন (৩০৬পৃঃ)। অস্থলে বেসবার প্রক্ষেপ করিলেন, শাক (বর্তমান আনাজ) রাঁধিতে হাঁড়ীর কানা পর্যন্ত জল ঢালিলেন, পরলা (পুরুল বা ধুন্দুল) ঘৃতে ভাজিতে বসিয়া কাঁচা গুআ ভাজিলেন, নিমঝোলে ছোলঙ্গ নেবুর রস দিলেন, আর বিনা জলে শূন্য হাঁড়ীতে চাউল চড়াইলেন। *কবি তৎকালের জনসাধারণের ভোজ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কবির গ্রামে* গুআগাছ ছিল, কাঁচা গুআ পাওয়া যাইত। অন্য দূর দেশ হইতে আসিলে শাদা থাকিত না, গুআতে পরলা ভ্রম হইত না। গ্রীষ্ম ও প্রচুর বর্ষার দেশে, প্রায়ই সমুদ্র হইতে ২০০ মাইলের মধ্যে, গুআ স্বচ্ছন্দে জন্মে। বাঁকুড়া ছাতনা মানভূম সে দেশ নয়। বিষ্ণুপুর হইতে ৩২ মাইল পূর্বে দামোদর ও বর্দ্ধমান জেলা। দামোদরের পলিতে রসা মাটিতে গুআ জন্মিতে পারে। বোধ হয় সে অঞ্চলে উক্ত পদের কবির বাস ছিল। "শূন্যপুরাণে" গুআর বাখারি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। পরে দেখিয়াছি, সে গুআও সে অঞ্চলের। কৃ-কীর ও 'শূন্যপুরাণে"র খে-ড (খড) শব্দও সে অঞ্চলের। (শব্দটি এখনও আছে)।

(১১) করিঞা, হইঞা দেখিলে লঞা হঞা খাঞা পাঞা বানান অশুদ্ধ। বোধ হয়, কবি ঞা লিখিয়াছিলেন, পরে ঞ ত্যাগের ইচ্ছায় কেহ য়া করিয়াছিলেন। আর এক হাতে য়া স্থানে ঞা হইয়াছিল। য় বর্ণের অ ধ্বনি কৃ-কীর কুঁ-য়-র (কুমার) কোঁ-য়-ল (কোমল) শব্দে আছে। কিন্তু ইহা সাধারণ নয়। গা-য়ি-ল, কু-য়ি-লী প্রভৃতি শব্দে সে ভুল নাই। "শূন্যপুরাণে" জ-অ (জয়)। কিন্তু শূন্যপুরাণের গায়ক অশিক্ষিত ছিলেন। ছাতনায় লিখিত শত বৎসর পূর্বের "চণ্ডীদাসচরিতে" য় সর্বত্র অ হইয়াছে। যেমন, উ-দ-অ (উদয়), ব-অ-স (বয়স)।

(১২) কবি শিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন, নিয়ম মানিয়া চলিতেন, পণ্ডিতের লক্ষণই এই। কৃ-কীতে চন্দ্রবিন্দু বা অর্ধানুস্বরের বাহুল্য সত্ত্বেও আ-খ-র, আ-পি, হা-সি, খু-জ ও ঘু-চ ধাতু সংস্কৃত রূপ-অনুসারে চন্দ্রবিন্দুহীন। কেবল সং ঝটিতি স্থানে ঝাঁ-ট হইয়াছে। শত বৎসর পূর্বেও ছাতনায় ঝাঁ-ট ছিল। ঠ-ম্নি, আত-ভোড়ি শব্দে চন্দ্রবিন্দু না দিয়া নিয়মভঙ্গ করা হইয়াছে। সে কবি বিভক্তি-প্রত্যয়ের অর্ধানুস্বরে নিশ্চয় নিয়ম মানিতেন। কিন্তু কৃ-পুথীতে অনিয়ম দেখিতেছি। শব্দের আদ্য অকার স্থানে আ বানানেও এই তর্ক। কবি সাঁওতালের

দেশে বাস করিতেন, "শব্দার্থে" ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হিন্দী ও সাঁওতালীতে বিবৃত ও সংবৃত, দ্বিবিধ অ আছে। কবিও সর্বদা কথিত শব্দের আদ্য অ স্থানে আ লিখিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয় নিয়ম মানিতেন। বোধ হয়, কবি অকারান্ত শব্দের অ উচ্চারণ করিতেন। ইহাতে ছন্দের লালিত্য রক্ষা হইত। রৌ-দ কদাপি রৌদ্ উচ্চারিত হইত না। উড়িয়াতেও রৌদ। কৃ-পুথীর বানানে ইহার বৈলক্ষণ্য ধরিবার উপায় নাই।

(১৩) কবির দেশে ও কালে সংস্কৃত-ভব শব্দে স এই এক ধ্বনি ছিল, শ ষ ছিল না। এই অভ্যাস হেতু সংস্কৃত শব্দের শ ষ স্থানে স আসিতে পারিত। যেমন, আ-কা-স, স-ক-ট, সা-ক। কিন্তু কৃ-পুথীতে শ ষ স বানান নিয়মহীন। "চণ্ডীদাসচরিতে" একমাত্র স আছে, শ ষ নাই।

(১৪) আরও বোধ হয়, কবি ন ণকারের উচ্চারণপ্রভেদ করিতেন। এই অনুমানের দুই হেতু পাইতেছি। (১) কৃ-কীর যে যে শব্দে ণ আছে, সে সে শব্দ ওড়িয়াতে ণ লিখিত ও উচ্চারিত হয়। ওড়িয়াতে হয় কৃ-কীতে নাই, এমন শব্দ অল্প। (২) ছাতনার দিকে বহু সাঁওতালের বাস আছে। সাঁওতালীতে ন ণ ওড়িয়াতুল্য স্বতন্ত্র। অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালিতে আছে, পূর্বকালের সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত হয়। যে সকল সাঁওতাল বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালী শিক্ষকের কাছে বাঙ্গালা উচ্চারণ শিখিয়াছে, ণ-কার উচ্চারণ শিখে নাই। সং ব্রাহ্মণ তাহারা সাঁওতালীতে বা-ম-ড়েঁ লিখে, কিন্তু বুঝে, বানানটা ঠিক নয়। স° গৌণী, বা° গুণ (থলি) সাঁওতালীতে গ-ণে। এই শব্দে কেহ গঁ-ড়েঁ, কেহ গ-ড়েঁঞ বানান করিয়া আপনাকে নিরুপায় মনে করে। কৃ-কীতে যে শ ষ স্থানে স, এবং ন স্থানে ণ পাইতেছি, তাহা লিপিকরের লেখনীনিঃসৃত মনে হয় না।

দেখা যাইতেছে, কবির পদের সংস্কার হইয়াছে। অপর কবির পদের সহিত মিশ্রণ হইয়াছে। কোথায় পশ্চিমোত্তরে মানভূম, আর কোথায় পূর্বদক্ষিণে বর্দ্ধমান, এই তির্যক্‌রেখাক্রমে কবির গীত প্রবাহিত হইতে হইতে দ্বিবিধ ত্রিবিধ মৃত্তিকার গুণ পাইয়াছে। এখন সে বারি শোধন অসম্ভব। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের প্রচার হয় নাই। কৃ-কী পড়িবার পাঠক অল্প। আমার বোধ হয়, কৃ-কী হইতে পদ বাছিয়া, ভাষা যথাসম্ভব "চণ্ডীদাসী" করিয়া "চণ্ডীদাসের শতপদ" নামে পৃথক্ পুস্তক প্রকাশ করিলে সাধারণ পাঠকেও অল্পটীকার সাহায্যে রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়



চণ্ডীদাস—১৫ পৃষ্ঠা।

	প্রথম লেখক ক-হাতেব	দ্বিতীয় লেখক গ-হাতের
১	১	১
২	২ ২	২
৩	৩	৩
৪	৪ ৪	৪ ৪ ৪
৫	৫ ৫ ৫	৫
৬	৬ ৬	৬
৭	৭ ৭	৭
৮	৮ ৮ ৮	৮
৯	৯	৯
০	০	০

চণ্ডীদাস—২৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল*

কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ানিবাসী পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। তিনি নিজেও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় চৌদ্দটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও কোনপ্রকার ঋণ স্বীকার না করিয়া ২৭টী প্রধান প্রধান ঘটনার আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করিয়াছেন। বংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র রাজবল্লভ তাঁহার "মুরলী-বিলাস" গ্রন্থে (২৮৫-৮৬ পৃঃ) উক্ত নাটকে বর্ণিত বিষয় (৯।৪৩) প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরেও এই নাটকের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৬৩৪ শকে (১৭১২-১৩ খৃষ্টাব্দে) কুলনগরনিবাসী পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ বনাম প্রেমদাস বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

নাটকখানির রচনাকাল ঠিকভাবে নির্ণীত হইলে ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে কত দূর প্রামাণিক, তাহা স্থির করা সহজ হইবে। এই নাটকের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ ও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে,—

> শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
> গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
> তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা
> গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

এই শ্লোক দেখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনাকারিগণ স্থির করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি হয় ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে; নয় ১৪০৭+৯৪=১৫০১ শকে বা ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। থিয়োডর অফ্রেট্ কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া নাটক-রচনার কাল ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন (Catalogus Catalogorum, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। এই তিনটী সিদ্ধান্তের কোনটীই নাটক-রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় যে রাজার বা ঘটনার উল্লেখ করিয়া নাটক অভিনীত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাকে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় আছে যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যবিরহে শোকাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শোক অপনোদন করিবার জন্য এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় (১।৪-৫)। এই প্রসঙ্গে প্রতাপরুদ্রের পরাক্রম ও ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে (১।৭)। প্রতাপরুদ্রের শোক অপনোদনের জন্য নাটক রচিত হইলে কর্ণপূর উহা ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। কেন না, সকল ঐতিহাসিকের মতেই প্রতাপরুদ্র ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকে গমন করেন।

---

* ১৩৩২, ২৩এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে রচিত গ্রন্থকারের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের পূর্ব্বে নাটকখানি লিখিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। নাটকের কোথাও মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত বা শ্রীচৈতন্যবিষয়ক অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই, অথচ চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিত আছে যে, তিনি মুরারির গ্রন্থ দেখিয়া লীলা বর্ণনা করিতেছেন। উক্ত মহাকাব্যের সহিত নাটকখানি আমি মিলাইয়া পড়িয়াছি। তাহার ফলে দেখিতেছি যে, নাটকে কবির নিজের পিতার কথা যথেষ্ট আছে (৮।৫৭, ১০। ১, ১০।৩, ৯।৯-১২, ৯।৩১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহাকাব্যে পিতার কথা যৎসামান্য আছে (১৩।১২৭, ১২৮; ১৪।১০০-১০২; ২০।১৭-১৮ দ্রষ্টব্য)। ১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে যে তিনি নিজের পিতার সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কবিষয়ক ঘটনাগুলি জানিতেন না, এমন হইতে পারে না। তবে মহাকাব্যে এ বিষয়ে এত কম লিখিলেন কেন? তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, নাটকখানি মহাকাব্য রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এবং নাটকে এই বিষয়ে সব কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং মহাকাব্যে আর উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নাটকে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-জীবনের সম্বন্ধে তথ্য বা সংবাদ খুব কমই আছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-গমনের পূর্ব্ব-জীবনের যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি ভ্রম আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নাটকে আছে, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পর অদ্বৈতের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য সহ আসেন এবং অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ভো অদ্বৈত! নবদ্বীপে কশ্চিৎ প্রহিতোঽস্তি?"—"অদ্বৈত! নবদ্বীপে কাহাকেও পাঠান হইয়াছে কি?" মুরারির গ্রন্থে (৩।৪।৪-১০) আছে, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ আসিয়া শচীগৃহে ভোজনাদি করিয়া, পরদিন সকলকে লইয়া শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। মুরারির এ সম্বন্ধে ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সত্য; কেন না, তিনি নিত্যানন্দের নিকট সব শুনিয়াছিলেন। তিনিও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন (চৈতন্যভাগবত—পৃঃ ৩৭৪-৩৭৬, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ)। সুতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ ভ্রান্ত। কর্ণপূর মহাকাব্য লিখিবার আগে মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। সেই জন্য মহা-কাব্যে (১১।৬৩-৬৪) নিত্যানন্দের নবদ্বীপগমন ও শচী সহ ভক্তগণকে শান্তিপুরে আনয়ন বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকাব্য ১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। যদি চন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭২-৭৩ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইত, তাহা হইলে প্রথমে মহাকাব্যে সত্য বিবরণ বলিয়া, ৩০ বা ৩৭ বৎসর পরে কর্ণপূর তাহার বিরুদ্ধে বিনা কারণে মিথ্যা বর্ণনা করিতেন না। সেই জন্য বলিতে হয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের পূর্ব্বে লেখা এবং মুরারির গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বের রচনা। নবদ্বীপলীলা বিষয়ে কর্ণপূর যদি মুরারির গ্রন্থ পড়ার পূর্ব্বে কিছু লেখেন, তবে তাঁহার ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কেন না, এই বিষয়ে তাঁহার নিজের বা তাঁহার পিতার ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু নীলাচললীলা বিষয়ে শিবানন্দ সেনের উক্তি খুব প্রামাণিক।

কেন না, তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ হইতে প্রতি বার নীলাচলে যাইতেন। কর্ণপূরও পরবর্ত্তী সময়ে নীলাচলে যাইতেন। নাটকে (১।৭৬-৭৯) মুরারি সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মুরারি স্বগ্রন্থে (২।১৪।১২-২৩) বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির নিজের সম্বন্ধে ঘটনা বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তির অপেক্ষা বড় প্রমাণ অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থানেও নাটকে ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। মহাকাব্যে (৫।১৬-২১) কর্ণপূর এই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

মনে হয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের কালবাচক শেষ শ্লোকটী গ্রন্থকারের রচিত নয়। কেন না, গ্রন্থকার সাধারণতঃ "কতমস্য বক্ত্রাৎ" (কোন ব্যক্তির মুখ হইতে) এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না। উক্ত শ্লোকের "আবিরভবৎ" শব্দের মুখ্যার্থ—প্রকাশিত হইয়াছিল, রচিত হইয়াছিল নহে। সেই জন্য অনুমান হয়, ভরতবাক্য বা মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটী অভিনেতৃবর্গের পক্ষ হইতে প্রথম কথিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে উহা নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।* নাটকের অন্তে দ্বিতীয় শ্লোকে (নির্ণয়সাগর সংস্করণের ২০৩ পৃঃ) গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"বালেন যেয়ং ময়া"। ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণপূরের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশের উপর হইয়াছিল। বৈষ্ণবেরা নানারূপে দৈন্য প্রকাশ করেন জানি, কিন্তু পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সের লোক নিজেকে বালক বলিয়া বিনয় প্রকাশ করেন না। এই সব কারণে আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।†

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

দানকেলিকৌমুদীর কালনির্ণয়‡

শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার শেষে আছে,—

"নান্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা।
গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে॥"

মনুশতের অর্থ ১৪০০, কিন্তু গোল বাধিয়াছে "চন্দ্রস্বর" লইয়া। চন্দ্র ১, স্বর অর্থ সাতও হয়, তিনও হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর অর্থে ৭ ধরিয়া ১৪৭১ শকাব্দ নাটক রচনার কাল নিরূপণ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটির কাব্যগ্রন্থের বিবরণে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, ২৭০পৃঃ) স্বর অর্থে তিন ধরিয়া ১৪৩১ শক উহার রচনার কাল

---

* এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভরতবাক্য-বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য (Ind. Hist. Quart. ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১)।

† নাটকের শ্লোকসংখ্যা প্রভৃতি রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ হইতে দেওয়া হইয়াছে।

‡ বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ২৩এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ১৪৩১ শক রচনার কাল হইতে পারে না; কেন না, তখন শ্রীচৈতন্যের বয়স ২৪ বৎসর, এবং কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচরিতামৃত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে শ্রীরূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই এবং শ্রীরূপ বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী নান্দীশ্বরে যান নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে পদ্যাবলীর যে সুন্দর সংস্করণ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৪৭১ শকে এই ভাণিকা রচিত হইতে পারে না। কেন না, ১৪৬৩ শকে রচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পদ্যাবলীর ভূমিকা, ৫২পৃঃ)। তিনি 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' মানেন নাই এবং ভাণিকার রচনার কাল ১৪১৭ স্থির করিয়াছেন। ১৪১৭ শকে শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র দশ বৎসর হয়। সেই সময়েই শ্রীরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নান্দীশ্বরে বাস করিতেছিলেন বলিলে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। আর ঐ ভাণিকা যে বৃন্দাবনের আবহাওয়াতেই রচিত, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যেই আছে। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি যে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বা তাঁহার আদেশে রূপ ও সনাতনের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাণিকার কয়েকটী ঘটনা কুণ্ডতটে ঘটান হইয়াছে। সেই জন্য ইহা ১৪১৭ শকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মানিতে পারিলাম না। ডক্টর দে মনে করেন, ভাণিকায় শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার নাই; সে জন্য ইহা রূপসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে রচিত। আমি অনুমান করি যে, ইঙ্গিতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার ভাণিকার মঙ্গলাচরণে আছে। যথা,—

নামাকৃষ্টরসজ্ঞশীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি॥

"সনাতনাত্মা"র এক অর্থ—"সনাতনো নিত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য"; অন্য অর্থে "সনাতনো নাম আত্মা দেহো যস্য সঃ।" উভয় অর্থেই শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইতেছে, বিশেষতঃ নামাকৃষ্ট শব্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্য পক্ষে অর্থ স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। অতএব মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই এই ভাণিকা রচিত হইয়াছিল। তিনি পছন্দ করিতেন না যে, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন। সেই জন্য দ্ব্যর্থবাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য ও সনাতনকে প্রণাম করিয়াছেন।

এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে দেখা যাউক, ভাণিকার রচনাকাল কবে হইতে পারে। আমি অনুমান করি, 'গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে' স্থানে শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন—"গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রশরসমন্বিতে"। "শর" লিপিকরপ্রমাদে 'স্বর' হওয়া বিচিত্র নহে। "শর" অর্থে পাঁচ; সুতরাং তারিখ ১৪৫১ শক অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চারি বৎসর পূর্ব্বে। এই অনুমান যদি যথার্থ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শ্রীরূপের নান্দীশ্বরে বাসের পরেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল স্থির হয় এবং ১৪৬৩ শকের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাণিকার শ্লোক উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল*

কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে বলরাম কবিশেখর-রচিত বিদ্যাসুন্দরের একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় তিনি অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে কৃষ্ণরাম দাসরচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি আছে। ইহাতে গ্রন্থকার সঙ্কেতে এই পুস্তকের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিন্তাহরণ বাবু তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন,—"যে সঙ্কেতে কবি নিজের কাব্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা ভেদ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত। তবে অবং সাহা (আওরঙ্গজেব) ও সারিস্তা খাঁ (সায়েস্তা খাঁ), এই দুই জনের উল্লেখ হইতে তাঁহার অবির্ভাবকালের অনুমান করা যাইতে পারে।" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের (পঞ্চম সংস্করণ) ৪৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি (কৃষ্ণরাম দাস) এক দিবস জনৈক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন। সেই রজনীতে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা রায়মঙ্গল হইতে সেই অংশ পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্যরচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরাম কবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালে লেখা। এই পুথি নকল করিবার সময়ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই;—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।"

আমরা এক্ষণে কৃষ্ণরামের "কালিকামঙ্গলে"র সঙ্কেত হইতে সময় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন,—

অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে॥
সারসা সানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥

অরংসাহা যে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং সারিস্তা খাঁ শায়িস্তা খাঁর অপভ্রংশ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যখন নবাব শায়িস্তা খাঁ

* সন ১৩৪২, ২৬এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালাব সুবাদাব, তখন ইহা রচিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, সঙ্কেত হইতে আমরা কি স্থির করিতে পারি। "সারসা সানের নেত্র" এই কথাটী হইতে আপাততঃ কিছুই বোধগম্য হয় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, শায়িস্তা খান লিপিকরপ্রমাদে "সারসা সানে" পবিণত হইয়াছে। শায়িস্তা খাঁব এক চক্ষু নষ্ট হইযা গিয়াছিল, সুতবাং 'সারসা সানেব নেত্র' ইহার অর্থ 'এক'। "ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র" এই কথায় "ভীমা" শব্দের অর্থ কালী; তাঁহার তিনটী নেত্র, সুতরাং ভীমাক্ষি বলিতে বুঝা যায় "তিন"। মিত্র শব্দেব অর্থ সূর্য্য; দ্বাদশ সূর্য্য হইতে সহজেই অনুমিত হইবে, "মিত্র' শব্দে বার (১২) সূচনা কবিতেছে। সুতবাং 'ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র' অর্থে ১২—৩=৯ নয়। "তেজিয়া ঋষিব পক্ষ" এই কথায় ঋষি শব্দে সাত বুঝাইতেছে এবং পক্ষ শব্দে দুই বুঝাইতেছে। ঋষির পক্ষ ত্যাগ করিলে ৭—২=৫ পাঁচ হয়। "বিধুব মধুব ধাম" বাক্যে বিধু শব্দেব অর্থ এক। এখন আমরা পাইতেছি, এক, নয়, পাঁচ, এক। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। সুতবাং ১৫৯১ শক অর্থাৎ ১৫৯১+৭৮বা ৭৯=১৬৬৯ বা ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ এই গ্রন্থবচনাব কাল পাইলাম। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পাবি, শায়িস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম বার এবং ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯খ্রীঃ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বাব বাঙ্গালাব সুবাদাব ছিলেন।* অতএব শায়িস্তা খাঁর প্রথম বাব বাঙ্গালা শাসনকালেই কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুধীগণ আমাব এই কালনিরূপণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

---

* ৺নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু—দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—ডাকার্ণব। কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত। নূতন লব্ধ পুথি অবলম্বনে পরিষৎ-প্রকাশিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র অন্তর্গত ডাকার্ণবের অভিনব সংস্করণ, তিব্বতী অনুবাদ ও সংস্কৃত ছায়া সহ এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুহম্মদ এনামুল হক্ ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—আর্‌কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্‌কান প্রদেশে বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের দান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহম্মদ এনামুল হক্—চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ। চট্টগ্রামের কোহিনূর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে চট্টগ্রামের চলিত ভাষার ব্যাকরণ আলোচিত হইয়াছে এবং সংক্ষিপ্ত নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—দাদূ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রসিদ্ধ সাধক দাদূর জীবনবৃত্তান্ত, সাধনা ও উপদেশের বিস্তৃত আলোচনা।

প্রবন্ধ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদকর্ত্তা দাস রঘুনাথ ও নৃপ রঘুনাথ। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪২, পৃঃ ১১২-১৬। রঘুনাথ দাস ও নৃপ রঘুনাথের কাব্যালোচনা ও পরিচয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাস কি তিনজন ছিলেন? বঙ্গশ্রী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪০৭-১৩। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস, এই তিন জনের কাব্যালোচনা ও পরিচয়।

মুহম্মদ এন্স হারুণ ফয়েজ—চট্টগ্রামের পল্লীগান। মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়' ৪২, ৬৪৩-৬৪৮। দেশের সংস্কৃতির উপর এই পল্লীগানের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা।

শ্রীঅনাথনাথ বসু—বাংলা শিখাইবার প্রণালী। প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ১৯-২৪।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাসচরিত। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩০৯-৩২৬। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও রামীর জীবনবৃত্তান্ত-বিষয়ক কৃষ্ণসেন-রচিত শতবর্ষ পূর্ব্বের একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পুথির বিস্তৃত বিবরণ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—*A Roman Alphabet for India. Journal of the Department of Letters*। ২৭শ খণ্ড। ভারতীয় ভাষা-লিখনে রোম্যান অক্ষর প্রবর্ত্তনে সুযোগ-সুবিধার আলোচনা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—ত্রিপুরা আগরতলায় গীতচন্দ্রোদয়। বঙ্গশ্রী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৬৭২-৬৭৬। নরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত পদাবলী-সংগ্রহের প্রাচীন গ্রন্থ গীতচন্দ্রোদয়ের পুথির পরিচয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৬১২-৬১৮।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বাংলা ভাষার এক দিক্। ভারতবর্ষ' ৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯১৯-৯২১। বঙ্গভাষার অক্ষরসংযোগ-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস—রজত-জয়ন্তী—ভারতসাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১—১৯৩৫)। ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বেঙ্গল জার্ণালস্ লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্রাটের রাজত্বের বিগত পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিভাগে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম দুই খণ্ডে যে সকল সংবাদ বাদ পড়িয়াছে, বর্ত্তমান খণ্ডে সেই সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন সেন—উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য—প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪-৯।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—শম্ভুনাথ পণ্ডিত। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৭৭-৫৮১, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৬৯৯-৭০৮। ইংরাজ আমলে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা।

শ্রীমতিলাল দাশ—সেকালের আবৃত্তি। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ২০৯-২১১। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন কালের আবৃত্তির যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা।

শ্রীগোবিন মুখোপাধ্যায়—সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪৫-৪৬। গুজরাতের বারিয়ারাজ্যে ভাট-মুখে প্রচলিত মহম্মদ ঘোরীর কাহিনীর বিবরণ।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার—একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজদ্রোহ ও ঐতিহাসিকের কৈফিয়ৎ। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪২, পৃঃ ১৮ ২২। কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোক-প্ররোচিত বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—ত্রিপুরারাজ যশোমাণিক্য। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩২-৩৯। রাজমালা, বাহার-ই-স্তান ও কতকগুলি মুদ্রার সাহায্যে যশোমাণিক্যের রাজ্যকালের বিবরণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা—হিন্দু প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৯০-৯৭। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে হিন্দুদিগের কৃত কার্য্যের পরিচয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৬৫-৫৭২, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৭৬৮-৭৫। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কবি গোবিন্দদাস ঝা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৮০৮-৯। কবির পরিচয় ও কাব্যালোচনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯শ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪২, পৃঃ ৭৫৭-৭৬৫। সরকারী দলিল-পত্র, দেশী সাহিত্য, বিদেশী সাহিত্য ও পুরাতন সংবাদপত্র এই বিষয়ে কিরূপ সাহায্য দান করিতে পারে, তাহার আলোচনা।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শতবর্ষ পূর্ব্বের বাংলার শর্করাশিল্প। প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৭২-৭৪।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়—প্রাচীন তোসলীর স্থাননির্ণয়। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ১৭৮-১৮২। এই প্রবন্ধে মেঘেশ্বরের শিবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী শিশুপাল নামক গ্রামকে প্রাচীন তোসলী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ মিত্র—প্রাচীন ভারতে উৎসব। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫৩৪-৫৪৫। পালিগ্রন্থ অবলম্বনে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের এক দিক্। ভারতবর্ষ' ৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮৪১-৮৫১। বৈদিক যুগে হিন্দুর জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত ও তাহার ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী—আমেরিকা আবিষ্কার। ভারতবর্ষ '৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৪৪-৯৫৯। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত পাতাল ও বর্ত্তমান আমেরিকা অভিন্ন, খৃঃ-পূঃ ১৩০০০।১৪০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এসিয়াবাসিগণ আমেরিকায় যাতায়াত করিতেন, ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

দর্শন

গ্রন্থ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ—মধুসূদন সরস্বতীকৃত ভক্তিরসায়ন, বঙ্গানুবাদ সহ। ২১এ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড্ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রবন্ধ

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী—তথাগতের সাধনার একটী দিক্। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৯। তথাগত মনোবিজ্ঞানকেই ধর্ম্মের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—উপনিষদের ব্রহ্ম। ভারতবর্ষ' ৪২, বৈশাখ, পৃঃ ৬৬৫-৬৭১।

হুমায়ুন কবির—ইমানুয়েল কাণ্ট। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫১১-৫৩১। দর্শন-শাস্ত্রে কাণ্টের মতবাদের আলোচনা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—মানবের নিয়তি। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫৬০-৫৭৫। সোঽহং-সিদ্ধিই মানবের উচ্চ নিয়তি, এই কথাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নবগঠিত পরিভাষা-সমিতির সভ্যগণকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিচারিত গণিত-বিষয়ক পরিভাষা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন—মেঘদূতে আবহতত্ত্ব। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ১-৯।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—রূপদর্শন। বঙ্গশ্রী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪২৪-৪৩৩। শিল্প বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন আদর্শ নির্দ্দেশ।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য—প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৫১-৫৫৯।

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু—মণিপুরের কোম ও চিরু জাতি। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ১৮২-১৮৮। জাতিতত্ত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিজ্ঞানের পরিভাষা। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩৬২-৩৬৭। বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদ রচনা বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি শব্দের অনুবাদের নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কেটি, সি আই ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে আজীবন-সদস্য, সহায়ক-সদস্য ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের পর একচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ ও ব্যালেন্স-শীট এবং দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে পর সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় নিম্নপ্রদত্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কয়েক জন সাহিত্যিক ও সদস্যের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপন ও তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশের পর অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।]

সভাপতির অভিভাষণ

এই দেশপ্রিয় ভারতবিশ্রুত পরিষদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতার্থ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এই পদকে আত্মগৌরবের উপকরণ বলিয়া গণ্য করি না, কর্ত্তব্যের কঠিন আহ্বান বলিয়া—দেশের প্রকৃত সেবার সুযোগ বলিয়াই, আপনাদের এই আজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলাম। আজকালকার অবস্থার মধ্যে যদি বঙ্গদেশের, বঙ্গভাষাভাষীদের স্থায়ী উপকার করা সম্ভব হয়, তবে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইবে। লোক-শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞানের ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রসারণ, সমাজের শ্রেণীগুলির, ধর্ম্মসম্প্রদায়-গুলির মধ্যে মিলনবন্ধন, গঠনশীল কর্ম্মের ভিতর দিয়া—শুধু কথার ফাঁকা আওয়াজ বা ব্যর্থ সমালোচনার দ্বারা নহে—দেশসেবকদের শক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ভবিষ্যতের সোনার বাঙ্গালা গড়িয়া তোলা আমাদের সামনে একমাত্র কাজ। এ কাজ আমাদের মাতৃভাষার লেখকগণ যেমন করিতে পারিবেন, অন্য কোন দলই তেমন পারিবেন না। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত বিক্ষিপ্ত সাহিত্য-চেষ্টার কেন্দ্র হইবে, এই আদর্শ লইয়া যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পৎ, বিপত্তি, গৌরব ও শক্তিহীনতা, অর্থাভাব ও স্বচ্ছলতার ভিতর দিয়া আজ ৪১ বৎসর ধরিয়া মাথা খাড়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহার জীবনব্রত বঙ্গের পক্ষে অতি মহার্ঘ মূলধন,—সে প্রতিষ্ঠান দেশের নিকট অবহেলার সামগ্রী হইতে পারে না। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কত কত জ্ঞানী-গুণী, সুধী-কর্ম্মী ইহার আজীবন সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখন অমরধামে, তাঁহাদের স্মৃতি আজ এই পুণ্যদিনে মনে আসে—রমেশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ ও ব্যোমকেশ ইহাকে লালন করিয়াছেন, দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কাশিমবাজারের মহারাজ ৺মণীন্দ্রচন্দ্র, পরলোকগত স্যর রাসবিহারী ঘোষ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি দাতৃগণ রুধির দিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। লালগোলার বর্ত্তমান অধিপতি মহারাজা শ্রীযুত যোগীন্দ্রনারায়ণকেও সেই সঙ্গে স্মরণ করি। আরও কত কত সেবক এই ৪১ বৎসরে নীরবে ইহার কাজ করিয়াছেন, তাহা বলিলাম না; আপনারা তাঁহাদের জানেন।

এই উপলক্ষে জীবিতের নাম উল্লেখ করিবার প্রথা নাই। কিন্তু এক জনের নাম না করিলে আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। আমাদের ঋষিতুল্য জ্ঞানবৃদ্ধ, যশোগরিষ্ঠ আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র অশেষ কর্ম্মের মধ্যে, শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও এই পরিষদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই, সভাপতি হইয়া আমাদের উৎসাহিত, বলিষ্ঠ করিয়া আসিয়াছেন। শরীর একেবারে অসমর্থ হওয়াতেই তিনি এ বৎসর হইতে অবসর লইলেন। তিনি চিরকুমার, কিন্তু বঙ্গীয়—বঙ্গীয় কেন, সমগ্র ভারতীয় যুবক-সম্প্রদায়কে পোষ্য লইয়াছেন। আর, আমরা যখনই পোষ্যপুত্রের উপযুক্ত যে আব্দার করিয়াছি, তাহা তিনি তাঁহার নামসদৃশ প্রফুল্ল বদনে মানিয়া লইয়াছেন, পিঠে দুই চাপড় মারিয়া সহী করিয়াছেন। আমরা সকল প্রকার সাহায্যই তাঁহার নিকট পাইয়াছি। পরিষদের কাজে তাঁহার নিকট গিয়া অনেকবার এ দৃশ্য আমি দেখিয়াছি। তিনি এ বৎসর হইতে আমাদের মধ্যে কায়িক উপস্থিত হইতে পারিবেন কম, কিন্তু তাঁহার পিতৃস্নেহ আমাদের মাথার উপর সমান জ্যোতিঃ বিস্তার করিবে—আরও বহু বর্ষ ধরিয়া করুক, এই প্রার্থনা পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে জানাইতেছি।

আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহকগণের অনেকে কঠোর দৈনিক পরিশ্রমের পর, প্রত্যহ সন্ধ্যায় ২।৩ ঘণ্টা করিয়া পরিষদ-মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া অফিসের হিসাব পরীক্ষা ও অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধান করিয়া, যাহাতে পত্র বা উত্তর প্রেরণে বিলম্ব না হয় অথবা টাকা বাঁচে, সে দিকে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাহা ভিন্ন অনেক শিক্ষিত যুবক কর্ম্মী দিনের পর দিন নীরবে অক্লান্ত অবৈতনিক শ্রম করিয়া, নানা বিভাগে ইহার কাজে সাহায্য করিতেছেন, ইহার উপকারিতা বাড়াইতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই আবার নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদের যে একটু মর্য্যাদা, তাহা পর্য্যন্ত নাই। তাঁহারা আমাদের সভার মাঝে অজ্ঞাত অখ্যাত রহিয়াছেন। এই দৃশ্য আমাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নিকট হইতে এরূপ অর্থ-যশোনিস্পৃহ আরামবিমুখ আন্তরিক সেবা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা ধন্য, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সেই মহাজাতির বলের ও অতুলনীয় উন্নতির প্রধান ভিত্তি—অগণিত অবৈতনিক রাজকার্য্যে, সমাজসেবায় দেশবাসীর আগ্রহ ও আত্মনিয়োগ।

ফলতঃ আমি গত কয়েক মাস হইল, এই পরিষদের দৈনিক কার্য্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া বুঝিয়াছি যে, আমাদের এই সহায়কগণ মানিয়া লইয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি বাণীপূজার, দেশের ও সজ্ঘের সেবার মন্দির মাত্র,—অর্থের জন্য, নামের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মল্লভূমি নহে। ঐ শ্রেণীর পুরস্কারে যাঁহাদের লালসা, তাঁহাদের জন্য বার্-লাইব্রেরী খোলা আছে, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ খোলা আছে—কোন কোন (নাম নাই বা করিলাম) ইলেকশন-বোর্ড খোলা আছে। কিন্তু আমাদের এই সরস্বতীর নিত্যপূজার প্রাঙ্গণে তাঁহারা যদি শোভাযাত্রা আনেন, কনুই মারিয়া ঠেলাঠেলি করেন, তবে কাহারই লাভ হইবে না, বরং দেশের স্থায়ী কাজে ক্ষতি হইবে।

কোন ব্যক্তির অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে একটা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়,—যেমন এসিড দ্বারা ধাতুর নিশ্চিত পরীক্ষা হয়। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি,—"লোকটি এই কাজ

করিয়া কি অর্থ লাভ করিতেছে?" এই পরীক্ষার দ্বারা আপনারা জানিতে পারিবেন যে, আমাদের এখনকার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও কমিটির সদস্যগণ পূর্ব্বের মতই অবৈতনিক; তাহার উপর তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ-সম্পাদক হিসাবে নিজ প্রাপ্য শত শত টাকা পরিষদকে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও উচ্চ অধ্যাপকের অভাব নাই, তাঁহারা যদি প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা এই মন্দিরে ওভার-টাইম কেরানীর মত না খাটিয়া, ঘরে বসিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেন বা গৃহশিক্ষকের কাজ লইতেন, তবে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

দাও মা আমায় তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী।

আমাদের এই ভারতীমাতার তবিলদারী যে শঙ্করীর তবিলদারী হইতে আরও কঠিন; এটা শুধু অনাহারী কাজ নহে, আমাদের তবিলদারগণ—অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণীর অবৈতনিক সহায়কগণ—গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া আমাদের কাজ করিতেছেন। এই সত্য বিস্মৃত হওয়া কি আমাদের উচিত?

তাই আজ আমাদের কার্য্যারম্ভে আপনাদের নিকট আমার আগ্রহের সহিত নিবেদন যে, যদি কেহ নিজের বা বন্ধুর নির্ব্বাচন না হওয়াতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, তবে তাহা ভুলিয়া যান, পরিষদ্‌কে দেশসেবার মন্দির জানিয়া পূর্ব্বের মতই অন্যান্য বিবিধ পথ দিয়া ইহার কাজে সাহায্য করিতে থাকুন, বিবাদ-বিতণ্ডার ক্ষণিক প্রবৃত্তিও মন হইতে দূর করুন। যেন আমরা বৎসর ধরিয়া বলিতে পারি,—

বিরোধো বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নির্বৃতিঘনঃ।

বিরোধ শেষ হইল, চারিদিকে গভীর নির্ব্বৃতিরস নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কারণ, মনে রাখিবেন যে, পরিষদের বড় দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, এ দিনে আমাদের বড়ই আবশ্যক—পরিষদের সর্ব্বশ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীর অন্তরের মিলন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ইহার একনিষ্ঠ সেবা। গত ৪১ বৎসরে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই কয়েকটি সমস্যা অতি জটিল আকারে আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ এই সমস্যা আমাদের আবাসগৃহ ও আয় লইয়া।

পরিষদ্-মন্দিরে অনেক অমূল্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা হস্তলিপি আছে, অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ ছাপান বই—বিশেষতঃ ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ও রমেশ দত্তের প্রাণের প্রিয় পুস্তকসংগ্রহ এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। আর রমেশভবনের কলাদ্রব্য, প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ প্রভৃতিও প্রচুর। সুতরাং এখানে প্রত্যহ বৈকালে এত পাঠক একত্র হন যে, তাঁহাদের সকলকে বসিবার স্থান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা ও জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইলেও, আমাদের লজ্জার কথা বলিতে হইবে।

আর একটি লজ্জার কথা এই যে, মহিলাদের পড়িবার, এমন কি, বসিবার জন্যও একটি পৃথক্ কুঠুরি দিতে পারিতেছি না। এখন আমাদের কন্যাগণ উচ্চ-শিক্ষালাভে, বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় পুরুষগণ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে, তাহাদের মধ্যে কেহ-না-

কেহ মুক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম পদ অধিকার করিতেছে, এ দৃশ্য এখন প্রায়ই দেখিতেছি। তাহারা কি আমাদের পরিষদের মহাভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? মনে রাখিবেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ মৌলিক গবেষণা—যেমন ডক্টরেট ডিগ্রীর গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে, আমাদের গ্রন্থাগারের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের অনেক পুথি জগতের অন্যত্র পাওয়া যায় না। যদি কোন সদাশয় মহাত্মা সাত হাজার টাকা দান করেন, তবে তাঁহার মাতার নামে একটি নারী-পাঠপ্রকোষ্ঠ গঠন করিতে পারি। তথায় এক জন অতিরিক্ত ভৃত্য থাকিবে। তৃতীয়তঃ আমাদের দুঃস্থ-সাহিত্যিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পরিমাণ বড়ই কম। আপনারা সকলেই দেশের দশা জানেন—বাণীসেবকের অবস্থা জানেন, কবির মর্ম্মক্রন্দন জানেন—

হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।

সুতরাং তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারদের সাহায্য করা এই পরিষদের একটি কর্ত্তব্য বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। এখন যদি আরও তিন-চার হাজার টাকা ইহার মূলধনে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে বড়ই উপকার হইবে, ইহার ফল অনেক যোগ্য বিধবা বা শিশু ভোগ করিবে।

এ বৎসর বহু কষ্টে আমরা আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু গত ১৫ বৎসরের আয়-সঙ্কোচের ফলে আমরা স্থায়ী তহবিল, অর্থাৎ বিপদের দিনের জন্য পুঁজী হইতে পৌনে আট হাজার টাকা ঋণ করিয়াছি। ফলতঃ সেই পরিমাণ মূলধন বাৎসরিক সাধারণ ব্যয়ে অতিরিক্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। এই ঋণ শোধ দিবার জন্য অনেক চিন্তা ও চেষ্টা আবশ্যক, তাহা আমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেছি।

একটি অল্পব্যয়-সাপেক্ষ, কিন্তু বড় উপকারী কাজ চারি শত টাকার জন্য পড়িয়া আছে; সেটি পরিষদের শ্রেণীবদ্ধ গ্রন্থতালিকা মুদ্রণ। এ কাজটি করিতে পারিলে এই যে দেড় শত পাঠক প্রত্যহ এখানে পড়েন, শুধু তাঁহাদের উপকার হইবে, এমন নহে—মফঃস্বলের সদস্যগণ এই তালিকার সাহায্যে পরিষদ্ হইতে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে পারিবেন। বাহিরের পণ্ডিতসমাজও আমাদের ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য জানিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। এই দানটি সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতেছি।

গত বর্ষে কয়েকটি দিকে পরিষদ্ নূতন কাজ করিয়াছে। তাহা আপনাদের সন্তোষের কারণ হইবে। (১) এখন আমাদের গ্রন্থ-বিক্রয়ের আয় বার শত টাকার অধিক হইতেছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে তিন-চার শত মাত্র ছিল, (২) পরিষদের সম্পত্তির একটা ব্যালান্স-শীট এবার সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইল। ইহাতে সকল সদস্য এবং বাহিরের জগৎ আমাদের অবস্থা নখদর্পণে দেখিতে পারিবেন, (৩) স্থায়ী তহবিল ও অস্থায়ী সাধারণ আয় পৃথক পৃথক্ স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা, (৪) আমাদের বাড়ীর জল-নির্গমের পয়ঃপ্রণালী গঠন, পানীয় জল

আনয়ন, শৌচাদির জন্য বিজ্ঞানসম্মত গৃহ (পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক্ পৃথক্) নির্ম্মাণ এই বৎসর শেষ হইল। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহকগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পরিষদ্ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে, এখন আমি সময়াভাবে সাহিত্য বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইতেছি। আমরা এতদিন ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক্ দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ বঙ্গদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রাজাসন পাইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা, নব্য-জ্ঞান-বিস্তার-কার্য্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি করা। এ কাজ না করিতে পারিলে আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হইয়া থাকিবে, ইহার নামের সার্থকতা লোপ পাইবে। এ বিষয়ে আমরা উপায় চিন্তা করিতেছি, পরে বিবৃতি প্রকাশ করিব।

কিন্তু এ কাজে আপনাদের সকলেরই সহানুভূতি ও সহযোগ অত্যাবশ্যক। মনে রাখিবেন, এই বৃহৎ দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্য একা সভাপতি সম্পন্ন করিতে পারেন না, কর্ম্মাধ্যক্ষগণও পারেন না। আপনাদের সকলকেই ইহাতে হাত দিতে হইবে, প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিবেন। আমরা এখানে বসিয়া সেই শ্রমফল জুড়িয়া সম্পূর্ণ করিয়া জগতের সমক্ষে দিব। সর্ব্বশক্তিমান্ অধিনায়ক ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ ডিক্টেটরের শক্তি অপেক্ষাও জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অধিক প্রবল ও অনেক অধিক কার্য্যকরী। আমরা সমগ্র জাতির নিকট সেই সাহায্য চাহিতেছি। এ প্রার্থনা কি বিফল হইবে? বাঙ্গালী উত্তর দিন।

সেনরাজগণের রাজ্যকাল*

বাঙ্গালার সেনরাজগণের রাজ্যকালসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আমরা মহারাজ বল্লালসেন-প্রণীত 'দানসাগর,' 'অদ্ভুতসাগর', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং তাম্রলিপি প্রভৃতির সাহায্যে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত করিব।

১। বিজয়সেনের রাজ্যকাল

দেওপাড়া-প্রশস্তি[১] হইতে আমরা অবগত হই যে, বিজয়সেন অনেকগুলি রাজাকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নান্য ও রাঘব নামে দুই জন রাজা ছিলেন। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই নান্য, মিথিলার রাজা নান্যদেব (১০৯৭ খৃষ্টাব্দ), এবং রাঘব উড়িষ্যার রাজা চোড়গঙ্গদেবের পুত্র রাঘব (১১৫৬-১১৭০ খৃষ্টাব্দ)। এই প্রমাণানুসারে বিজয়সেনের রাজ্যকাল অন্ততঃ ১০৯৭—১১৫৬ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের তারিখ 'সং ৩২ বৈশাখ দিনে ৭'।[২] শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন, ইহার প্রকৃত পাঠ হইবে,—'সং ৬২ বৈশাখ দিনে ৭'।[৩] এই শাসনখানি চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত। আমরা গ্রহণের তালিকায় ১০৩৯ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন বৎসর ৭ই বৈশাখ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইলাম না[৪]। এই শাসনের তারিখের অংশ বড়ই অস্পষ্ট। রাজ্যবর্ষের পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও দিনের তারিখ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগের সন্দেহ হয়, ইহার পাঠেও কিছু গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। ১ এবং ৭এর চিহ্নে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ১কে ৭ ভুল করা অসম্ভব নহে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে ১লা বৈশাখ চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।[৫] এমতাবস্থায় তারিখের প্রকৃত পাঠ খুব সম্ভবতঃ 'সং ৬২ বৈশাখ দিনে ১।' এই পাঠ অনুসারে গণনা করিলে বিজয়সেনের রাজ্যারম্ভ (১১৪৯—৬১=) ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিজয়সেনের রাজ্যকাল অন্ততঃ ১০৯৭—১১৫৬ খৃষ্টাব্দ। এই প্রমাণও আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে।

২। বল্লালসেনের রাজ্যকাল

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তীই প্রথম বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ-বর্ষের উল্লেখ-সম্বলিত অদ্ভুত-সাগরের নিম্নলিখিত অংশের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—[৬]

---

* সন ১৩৪২।২৮এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Bengal Inscriptions, Vol. III. pp. 42—56.

২। Epigraphia Indica, Vol, XV. p. 284.

৩। Bengal Inscrps., Vol. III. p. 64 n.

৪। Pillai's Indian Ephemerics, Vol. 1. pt. I., pp. 338—355.

৫। ঐ, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৬। J. A. S. B., Vol. II—1906, p, 17 n.

"ভুজবসুদশ ১০৮১ মিতশকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ বর্ষৈকষষ্টি মুনির্বিনিহিত বিশেষায়াং" এই পাঠটি যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা একবার পাঠ করিলেই বোধগম্য হয়। ইহার শেষাংশের কোন অর্থই হয় না। শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ই প্রথম ইহার নিম্নোক্ত অর্থসংযুক্ত পাঠ প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন,—[৭]"ভুজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্বল্লাল-রাজ্যাদৌ বর্ষৈকষষ্টিভোগো মুনিভির্বিহিতো বিশাখায়াম্"।—অর্থাৎ 'বল্লালসেনের 'রাজ্যাদৌ' ১০৮২ শকাব্দে মুনিগণ (সপ্তর্ষি) বিশাখা (নক্ষত্রে) ৬১ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন।'

কেহ কেহ 'রাজ্যাদৌ' শব্দের অর্থ করেন, 'রাজ্যের প্রথম ভাগে'। মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থে অন্যান্য গণনায় অদ্ভুতসাগরের আরম্ভকাল (১০৮৯ শকাব্দ) ধরিয়াই গণনা করিয়াছেন। অথচ সপ্তর্ষিগণনার সময় অদ্ভুতসাগর আরম্ভের ৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার রাজ্যকালের প্রথম ভাগের একটি বৎসরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন? অদ্ভুতসাগরের আরম্ভ-বৎসর দ্বারাও ত ঐ কার্য্য চলিতে পারিত? ইহা হইতে মনে হয় যে, ঐ বৎসরটির কিছু বিশেষত্ব ছিল। আমরা পরে দেখাইব, এখানে তাঁহার রাজ্যারম্ভের বর্ষই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে তারিখটি প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা নির্ণয় করা দরকার।

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় যে, রাজ্যারম্ভ-বর্ষ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে 'ভুজবসুদশ', আবার অঙ্কে লিখিত হইয়াছে ১০৮১ শক। ইহার কারণ কি? শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মনে করিয়াছেন যে, মনোমোহন বাবু 'ভুজবসুদশমিতশক'কে ভুলক্রমে ১০৮১ শকে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। মনোমোহন বাবু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের যে পুথি হইতে ঐ অংশ নকল করিয়াছেন, তাহাতেও ঠিক ঐরূপ ভাবেই লিখিত আছে। বস্তুতঃ পক্ষে ১০৮১ শকই বল্লালের রাজ্যারম্ভের অব্দ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শক ১০৮১ই প্রকৃত তারিখ, তাহা হইলে 'ভুজবসুদশমিতশক' লেখা হইল কেন? আমাদের মনে হয়, নকলকারীর ভুলে 'ভূ' (=১) 'ভুজ'এ পরিণত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ অদ্ভুতসাগরের শ্লোকটীর প্রকৃত পাঠ ছিল,—

ভূবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগো মুনিভির্বিহিতো বিশাখায়াম্॥

আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব, অন্য আর কোন প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে কি না। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনের তারিখ 'সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬'। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এই শাসনোক্ত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।[৮] শক ১০৮১ বা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ-বর্ষ হইলে একাদশ বর্ষ হয় ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে কোনও সূর্য্যগ্রহণ দেখা যায় না। আমাদের দেশে বর্ষগণনার দুই প্রকার প্রথা প্রচলিত ছিল। 'গত' (expired) এবং 'বর্ত্তমান' (current)। 'বর্ত্তমান' বা চলিত দ্বিতীয় বর্ষই 'গত' প্রথম বর্ষ নামে অভিহিত হইত। এখন ১১৫৮ খৃষ্টাব্দকে যদি বল্লালসেনের রাজ্যাব্দের 'গত' প্রথম বর্ষ ধরা যায়, তাহা হইলে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার 'বর্ত্তমান' প্রথম বর্ষ হয়। এই হিসাবে ১১৬৮

৭। Indian Historical Quarterly, Vol. V. pp. 133—5,

৮। Beng Inscrps. Vol. III. pp. 79—80.

খৃষ্টাব্দ রাজ্যাব্দের একাদশ বর্ষ হয়। এই বৎসর ১৬ বৈশাখ = ৯ই এপ্রিল তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, কিন্তু উহা ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই।[৯] গ্রহণ দৃষ্ট না হইলেও গ্রহণোচিত দানাদি ধর্ম্ম্য কার্য্য যে করা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিলহর্ণ সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই, এমন অনেক গ্রহণের তারিখ তাম্রশাসনাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[১০] সুতরাং এই প্রমাণবলেও আমরা ১০৮১ শককেই বল্লালের রাজ্যারম্ভ-বর্ষ বলিতে পারি।

১০৮১ শককে বল্লালের রাজ্যারম্ভবর্ষ ধরিলে আর একটি সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুর প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত তাঁহার মন্তব্যে দেখাইয়াছেন যে, ১০৮২ শকে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের ৬১ বৎসর ভোগ বর্ণনা করিয়া, অদ্ভুতসাগরকার সপ্তর্ষিসংবৎ গণনা এক বৎসর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ অব্দ সপ্তর্ষিসংবতের প্রারম্ভ দাঁড়ায়, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দকেই এই সংবতের প্রারম্ভ ধরা হয়। ১০৮১ শকাব্দকে রাজ্যারম্ভবর্ষ ধরিলে এইরূপ গোলমালের সৃষ্টিই হয় না।

৩। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল নির্ণয়েও পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তিদ্বয় অগ্রণী। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তীই প্রথম পণ্ডিতগণের গোচরীভূত করেন যে, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতের পুষ্পিকায় ঐ পুস্তকের রচনার তারিখ শকাব্দে ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাব্দে দেওয়া হইয়াছে।[১১] ইহার সকল পুথির পাঠই অল্পবিস্তর বিকৃত। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ই প্রথম নানা পুথি ঘাঁটিয়া নিম্নলিখিত অর্থসংযুক্ত পাঠ প্রকাশ করেন,—[১২]

"শাকে (চ) সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেঽব্দে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ
শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"

ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি, ১১২৭ শকাব্দে, লক্ষ্মণসেনের 'রসৈকবিংশেঽব্দে' সৌর ফাল্গুন মাসের ২০শে তারিখ সদুক্তিকর্ণামৃত রচনা শেষ হয়। সাধারণ নিয়মানুসারে 'রসৈকবিংশ' শব্দ দ্বারা ২১৬ বুঝায়। ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অনেকে ইহার অর্থ করেন (২১+৬=) ২৭। যখন আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ নিয়ম খাটে না, তখনই সন্দেহ হয়, নকলকারী ঠিক মত নকল করিয়াছে কি না। বস্তুতঃ ইহার বিভিন্ন পাঠও পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ বাবু বলেন যে, তিনখানি পুথিতে তিনি 'রন্ধ্রৈকবিংশে' পাঠ পাইয়াছেন। এই পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দোভঙ্গী ও অর্থাভাব হয়। তবে ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, 'র'

৯। Ind. Eph., Vol. 1. pt. I. p. 343.

১০। Indian Antiquary, Vol. XXII. p. 108.

১১। J. A. S. B., Vol II. p. 175.

১২। I. H. Q., Vol. III. p. 188.

অক্ষরটি ঠিকই আছে, ইহার পরবর্ত্তী অক্ষরে কিছু গোলমাল হইয়াছে। 'স' ও 'ম'এ অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ নকলকারীর ভুলে 'রমৈকবিংশ' [রমণীয় একবিংশ] 'রসৈকবিংশ' হইয়াছে। এই পাঠ গ্রহণ কবিলে লক্ষ্মণসেনের একবিংশ রাজ্যাব্দ ১১২৭ শক বা ১২০৫ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং তাঁহার রাজ্যাব্দের প্রথম বর্ষ (১২০৫—২০ =) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ।

এখন দেখা যাউক, এই তারিখেব কোন পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। লক্ষ্মণসেনদেবের শক্তিপুর তাম্রশাসনের তারিখ শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় পাঠ করিয়াছেন,—'সং ৩ শ্রাবণ দিনে ২'।[১৩] শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন, উহার প্রকৃত পাঠ হইবে 'সং৬ শ্রাবণ দিনে ৭'।[১৪] আমরাও এই শেষোক্ত পাঠ ঠিক বলিয়া মনে করি। আরও অনেকে এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।[১৫] লক্ষ্মণসেনের প্রথমাব্দ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইলে, ইহাব ষষ্ঠাব্দ হয় ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বৎসর ৭ই শ্রাবণ, ৪ঠা জুলাই সূর্য্যগ্রহণ ছিল।[১৬] এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং এখন আর সন্দেহ থাকিতেছে না যে, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল।

এখন আমরা ১১৮৫ খৃঃ অঃ রাজ্যারোহণ-বর্ষ ধরিয়া, অন্য তাম্রশাসনগুলির তারিখ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

মাধাইনগর তাম্রশাসনোক্ত[১৭] ভূমি ২৭শে শ্রাবণে অনুষ্ঠিত 'মূলাভিষেক' ও 'ঐন্দ্রী মহাশান্তি' উপলক্ষে প্রদত্ত। এই শাসনের বৎসরনির্দ্দেশের অংশ পাঠ করা যায় না। মূলাভিষেক বলিতে কোন তান্ত্রিক অভিষেক কিম্বা রাজ্যাভিষেক বুঝাইতেছে। অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন,—

"পুরোধসাভিষেকাৎ প্রাক্ কার্য্যৈন্দ্রী শান্তিরেব চ"।[১৮]

পুরোহিত কর্ত্তৃক অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাদিগের ঐন্দ্রী শান্তি করণীয়। সুতরাং ঐন্দ্রী শান্তির সহিত উক্ত মূলাভিষেক, রাজ্যাভিষেক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে প্রদত্ত গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে[১৯] দেখা যায়, উহা 'রাজ্যাভিষেক'কালে উৎসর্গীকৃত ভূমির দানপত্র। একজন রাজার দুই বার রাজ্যাভিষেক হইবার কারণ কি?

অদ্ভুতসাগরের উপক্রমণিকা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ বল্লালসেন ১০৮৯ শকে অদ্ভুতসাগর রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নিজ পুত্রের হস্তে সাম্রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া, গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ের অভিষেকই সম্ভবতঃ 'মূলাভিষেক' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পিতার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেনের যে অভিষেক হইয়াছিল, তাহাই গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, কোন বৎসর লক্ষ্মণসেনের মূলাভিষেক হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মূলাভিষেক হইয়া থাকিবে।

১৩। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ সন, ২২৫ পৃষ্ঠা।
১৪। ঐ ঐ, ১৩৩৯, ৭০ পৃষ্ঠা।
১৫। Ep Ind. Vol. XXI. p. 216.
১৬। Ind. Eph., Vol. I. pt. I. pp. 248, & 349.
১৭। Beng Inscrps. Vol. III p. 112.
১৮। অগ্নিপুরাণ, ১১৮ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক।
১৯। Beng. Inscrps. Vol. III. p. 97.

সম্ভবতঃ বল্লালসেন মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, রোহিণী ও তিন উত্তরা নক্ষত্র, অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনীই রাজ্যাভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত।[২০] আমরা দেখিতেছি, ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ছিল। সম্ভবতঃ ঐ দিনেই মূলাভিষেক হইয়াছিল এবং উহাই মাধাইনগর শাসনের তারিখ বলা যাইতে পারে।

গোবিন্দপুর তাম্রশাসনোক্ত[২১] ভূমি রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে প্রদত্ত। সুতরাং ইহার তারিখ ১১৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ।

তর্পণদীঘি তাম্রশাসনোক্ত[২২] ভূমি হেমাশ্বরথ মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে ২৮শে ভাদ্র প্রদত্ত। সুতরাং ইহার তারিখ ১১৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ আগষ্ট। ঐ দিন তালনবমী বা নন্দনবমী ব্রতদিন বলিয়া দানের পক্ষে প্রশস্ত। রাখাল বাবু বলেন, ইহার তারিখ 'সং ৩ ভাদ্র দিনে ২'।[২৩] এই পাঠানুসারে ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর দিন।

সুন্দরবন তাম্রশাসনোক্ত[২৪] 'ভূমি' দ্বিতীয় রাজ্যাব্দের ১০ই মাঘ পুণ্যদিনে প্রদত্ত। ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃঃ অঃ, ৪ঠা জানুয়ারী, অষ্টকাশ্রাদ্ধের দিন।

আনুলিয়া তাম্রশাসনোক্ত[২৫] ভূমি তৃতীয় রাজ্যাব্দের ৯ই ভাদ্র পুণ্যদিনে প্রদত্ত। ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃঃ অঃ, ৬ই আগষ্ট, মহালয়াশ্রাদ্ধের দিন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যশেষের এবং তাঁহার পুত্রদিগের রাজ্যকাল নির্ণয়ের মতন উপকরণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা গেল না। আমাদের গণনানুসারে সেনরাজদিগের বংশাবলী ও রাজ্যকাল নিম্নে দেওয়া গেল।

সামন্তসেন
|
হেমন্তসেন
|
বিজয়সেন—১১৮৮—১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ
|
বল্লালসেন—১১৫৮—১১৮৫ ”
|
লক্ষ্মণসেন—১১৮৫—১২০৫ (?)
|
কেশবসেন — বিশ্বরূপসেন

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

২০। বৃহৎসংহিতা, ৯৮ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক। ২১। Beng. Inscrps. Vol. III. p. 97.

২২। Ibid. p. 103. ২৩। Ep. Ind. Vol. XII. p 9.

২৪। Beng. Inscrps. Vol III. p. 171. ২৫। Ibid. p. 88.

চণ্ডীদাস

[প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

১১। শব্দার্থ

চণ্ডীদাস স্বভাবকবি। তিনি তাঁহার দেশে ও কালে প্রচলিত ও সুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা পদ রচিয়াছেন, সুবোধ্য অলঙ্কার দ্বারা পদ ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার দেশ ও কালের স্পষ্ট জ্ঞান করিতে হইলে তাঁহার কাব্যের শব্দ ও অলঙ্কার আলোচনা কর্ত্তব্য। আমি এখানে শব্দার্থ চিন্তা করিতেছি।

শ্রীযুত বিশ্বদবল্লভ টীকা লিখিতে যত্নের ক্রটি করেন নাই। কিন্তু তিনি বহু শব্দের ভাবার্থ দিয়াছেন, সূক্ষ্ম ভেদ প্রদর্শন করেন নাই। যেমন, অবুঝি—নির্ব্বোধ, অনুবন্ধ—চেষ্টা। এইরূপ অর্থে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। কতকগুলি শব্দের অর্থে ভুলও হইয়াছে। যেমন, অভবস—অবিশ্বাস, অবিচারে—অলক্ষিতে। ৺সতীশচন্দ্র রায় কয়েকটা শব্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক শব্দ রহিয়া গিয়াছে। যেখানে টীকা-প্রদত্ত অর্থে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না, সেখানে অর্থ করিতেছি। আমার "বাঙ্গালা শব্দকোষে" অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমার প্রদত্ত অর্থের যোগ্যতা বিচার করিতে পারিলাম না।

কাব্যে সংস্কৃত শব্দ বিস্তর আছে। কৃ-কীর শব্দসূচীতে সকল শব্দ নাই। এই সকল শব্দের অর্থ নিমিত্ত সংস্কৃত কোষ আছে। সংস্কৃত শব্দ অশিক্ষিত প্রাকৃত জনের মুখে বিকৃত হইয়া থাকে, এখন হয়, পূর্বকালেও হইত। কিন্তু বিকারের ধারা চিরকাল একপ্রকার থাকে না। এক দেশের বিকার সকল দেশেই ঘটে, এমনও নয়। এমন ঘটিলে ভাষা থাকিত না। অমরকোষের সর্বানন্দী টীকায় তৎকালপ্রচলিত যে সকল প্রাকৃত শব্দ আছে, সে সকলের দুই চারিটা মাত্র কৃ-কীতে আছে। উভয়ের কালে মাত্র দুই শত বৎসরের অন্তর। সংস্কৃত-ভব শব্দের অর্থ নিমিত্ত সার্ধ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার মাগধী প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়াও ফল নাই। শব্দের সংস্কৃত রূপ না পাইলে অর্থ পরিস্ফুট হয় না। আমি এখানে সংস্কৃত রূপ দিয়াছি।

কবি পদের কোমলতাসাধন নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়াছেন। কতকগুলি তাঁহার কালে প্রাকৃত জনের মুখে প্রচলিত ছিল। যেমন, স্ত্রী—তিরী, স্থান—থান। কতক সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সম্প্রসারণ হইয়াছে, যেমন, বিমর্ষ—বিমরিষ, দুর্বার—দুরুবার। কতকগুলির বিপ্রকর্ষণ হইয়াছে, যেমন দর্শন—দরশন, প্রাণ—পরাণ। কতকগুলির পূর্বব্যঞ্জনের লোপ হইয়াছে, যেমন বুদ্ধি—বুধী, বিতর্পণ—বিতপন। শব্দের অন্ত্য য-ফলা ত্যক্ত হইয়াছে, যেমন অমূল্য—অমূল, সূর্য—সূর। অমূল্-য়, সূর্-য় উচ্চারণ দ্বারা লালিত্য নষ্ট হইত। অনেক শব্দের প লুপ্ত হইয়াছে, যেমন উনপঞ্চাশ—উনঞ্চাশ, গোপজাতি—

গো-জাতি, না-পাবিল—নাবিল। কুপালিনী, "শূন্যপুবাণে" কুআলিনী। শব্দেব আদ্যে অ আ, অ স্থানে ব, হ আগমের উদাহবণ অনেক আছে। ১২শ খণ্ডে বৃক্ষনাম পৃথক্ কবা গেল।

[শব্দার্থ-নির্দ্দেশে লক্ষণীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন—"বাঙ্গালাশব্দকোষ", যো-কোষ; বাঁকুড়ায প্রচলিত, বাঁকুডা, বাঁকুড়াব বিশেষ, বাঁকডী। শব্দেব অন্ত্য অক্ষবেব দক্ষিণ নিম্ন কোণে বিন্দু চিহ্ন দ্বাবা অকাবান্ত বুঝিতে হইবে। যেমন, কাল। এক একটী শব্দ সম্বন্ধে বক্তব্য-সমাপ্তি তারকা চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।]

অনুবন্ধ, আনুবন্ধ—স° অনুবন্ধ। প্রবৃত্তিব অনুবর্তন, মুখ্যানুযাযী। "চিব অনুবন্ধে" (৩৮৬), চিব বিধান অনুযাযী ॥ * ॥ অভবস—স° অমর্ষ। ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা। বোধ হয়, শব্দটি অ-ভঁ-ব-স ছিল। ভ-র-স পশ্চ। তু° আ-ত-ভো-ড়ি হইবে আঁত-মোড়ি ॥ * ॥ অবতী, আবতী—স° বতি। অ, আ আগম। "অবতী বাধিত হঞা পাপ কবিবেঁ" (১২৭), বতি-বাধিত, প্রীতি-পীডিত ॥ * ॥ অলঞ্জাল—স°। অলম্ নিবর্থক বাক্যজাল, বাগবাহুল্য। বোধ হয, বা° জ-ঞ্জা-ল এই অ-ল-ঞ্জা-ল ॥ * ॥ অবসই (১২৯)—স° অব-সদ্ ধাতু। বাঙ্গালায অবসদে, দ লোপে অবসএ, অবসই। শয়ন কবে। হংস সবোবব পাইলে তাহাতে বিশ্রাম কবে ॥ * ॥ অবিচাবে—স° অবিচাব। বিনা বিচাবে ॥ * ॥ অবুধ, অবুধি—স° অবুদ্ধি। অবুঝ ॥ * ॥

আকাইলেক (৭৬)—স° আ-কৃ ধাতু। আকাবিলেক, মন টানিলেক। ব লুপ্ত [আ-কু-ল হইলে আকুলাইলেক হইত] ॥ * ॥ আকাশ পাতাল (১০৭)—"বোল আকাশ পাতাল"—আকাশেব ও পাতালেব বার্তা ॥ * ॥ আচাবিজ্ঞ— স° আশ্চর্য ॥ * ॥ আছিদর, আছিদবী—স° ছিদ্র। আ আগম। ধূর্ত, তেঁদড। বাঁকুডাব চেঁদড ॥ * ॥ আছেব—আছে। আছেহ—আছেব। হ স্থানে অ, পবে ব। বাঁকুডা নিম্নশ্রেণীব। আ-নি-আ ব, দি-আ-ব অপ্রচঃ ॥ * ॥ আজল, আজলী—স° অজাপুত্র, অজাপুত্রী ? বোকা। হুগলী, নদীযায ॥ * ॥ আঠকপালী—স° হতকপালী। হতভাগ্য ॥ * ॥ আডন—স° আববণ। ঢাল ॥ * ॥ আড়বাঁশী—অন্য নাম মৌহাবী—স° মধুবী। (শব্দকল্পদ্রুমে বং-শী পশ্য)। সাঁওতালেবা সোজা বাঁশী ও আডবাঁশী, দ্বিবিধ বংশী বাজায়। তাহাবা সোজা বাঁশীকে 'মু-ব-লী' ও আড়বাঁশীকে 'গাণ্ডিতিবিঅ' বলে। (মুবলী পুবাতন স° নয।) কবিব বর্ণিত আডবাঁশী (৩১২, ২৯৩) অবিকল তিবিঅ। ইহা ১।০পোআ লম্বা। ফুৎকাব-বন্ধ্র ব্যতীত স্ববরন্ধ্র ছয়টি। অতএব "নাল" (স°) বন্ধ্র "সাতগুটি"। প্রান্তদ্বয় পিতলেব পাতে ও তাবে বাঁধা। ইহাতে কারুকার্য থাকে। দুই পাতে পিতলেব দুইটি ছোট পায়বা। পায়বা হইতে থোপ ঝুলিতে থাকে। পায়রার অন্তে দুই আংটায় সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া বাখা হয়। অবশ্য যে-সে সু-স্বর বাঁশী নির্ম্মাণ কবিতে পাবে না। কৃষ্ণ "কাজ আলোচিআঁ" গড়িয়াছিলেন। সোনার পাতে মাণিক খচিয়া, পায়বা হইতে বেশমেব থোপেব ঝাবা দিয়াছিলেন। তিনি সাঁওতালেব মতন বাঁশী বাজাইয়া কবতাল বাজাইতেঁন। জয়ানন্দে, "বংশী ভেরি মহুবী"। ও° মহুরী। কবিকঙ্কণে মুহরী ॥ * ॥ আত্তত—স°। বর্ধিত। "আত্তত বোল"—বাড়ানা কথা ॥ * ॥ আনচান বোলে—অন্য,

আন, জ্ঞান—সান—চান। অজ্ঞ জ্ঞানের কথা বলে, যেন পাগল ॥ * ॥ আন্নুখর—স' অনক্ষর। হীনাক্ষর, দুর্বাক্য ॥ * ॥ আপোঙষ—স° পাংশু, ধূলি, চূর্ণ। অ আগম। অ স্থানে আ। বা° পাঁ-শ, ও° পা-ঙ-স, প-ঙ-স.। স° পাংশু, অংশ, পূর্বকালের উচ্চারণে ও লিখনে পাঙশু, অঙশ। "মোএঁ আপোঙষ হৈবোঁ"—আমি চূর্ণ হইব, আমাকে মারিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে। আ-পা-ঙ-স হইবার কথা। বোধ হয়, পরে ঙ থাকাতে পা স্থানে পো। আ-পো-ষ লিপিকরপ্রমাদ। হইবে, আ-পোঁ-ষ, কিম্বা আ-পো-ঙ-ষ ॥ * ॥ আবাল, আবালী—বাল, বালী। আ আগম ॥*॥ আফার—ফার, ফাঁক। আ আগম ॥*॥ আরতিল—র, রতিযুক্ত, অনুরক্ত ॥ * ॥ আরপিল—আরোপিল। রো স্থানে র বাঁকুড়ী। তু° বাঁকড়ী মনহর (মনোহর), শিবমণি (শিরোমণি) ॥ * ॥ আরি (১৫১)—পারি, নদীর পার। প লুপ্ত ॥ * ॥ অলস নয়ন—ন য়-ন পশ্চ ॥ * ॥ আহুঁকিতে (২৪৩)—অঙ্কিতে—আঙকিতে—আউঁকিতে—আহুঁকিতে। আঁকিতে, চিহ্ন করিতে। হ আগম। এমন আগম আরও আছে। কৃষ্ণ রাধাকে নিজের মুকুট দিতেছেন। রাধা বলিতেছেন, তুই ভিতরে বাহিরে কাল। তোর মুকুটও এত কাল যে, জলে ধুইলে আঁকিবার কালী হইবে।

ইঞ্চলা খাআঁ বার পাড়িবে (১২৮)—ইঞ্চলা (ইঁচলা মাছ), চিংড়ী ও ঘুসা, এই তিন মাছ দক্ষিণরাঢ়ে সাধারণ। ছাতনায ও বাঁকুড়া নগরে ইচলা দূরে থাক, চিংড়ীও নাই। লোকে ঘুসাকে চিংড়ী বলে, আদরপূর্বক ইঁচলীও বলে। কবি ঘুসাকে ইঞ্চলা বলিয়াছেন। 'বার', ব্রত। ঘুসা খেয়ে ব্রত পাতিত করিবে, জাতি যাবে, পেট ভরিবে না।

উখুড়িবে—উৎখাত হইবে। হাট উখাড়িবে, হাট ফুরাইয়া যাইবে। এই শব্দ হইতে অনুমান হয, পূর্বকালে হাটুআরা বসিবার চালা নিজে করিত, বেচা হইয়া গেলে খুঁটি উপড়াইয়া লইয়া যাইত। বাঁকড়ী ॥ * ॥ উতরল—স° উৎ-তরল। অন্যত্র, উত্তরল। উৎ প্রাবল্যে, তরল, কামভোগার্থে চঞ্চল ॥*॥ উথলে—উত্থিত হইতেছে ॥ * ॥ উথাআঁ পাথাআঁ—উত্থাপিত ও প্রস্থাপিত করিয়া ॥ * ॥ উদাওঁ—স' উদ্দাম। বন্ধরহিত ॥ * ॥ উপসন, উপসন্ন—সং উপসন্ন। পূর্বকালে শব্দটির বহুল প্রয়োগ ছিল। এখন, উপস্থিত ॥ * ॥ উপেখ—ধাতু। উৎপ্রেক্ষণ, উপেক্ষা, দুই অর্থে ॥ * ॥ উঝঁট—সং উৎ-চট ধাতু অপসারণে। পাদাগ্র দ্বারা প্রস্তরাদি উচ্চাটন। হুঁচট। উতাপঠ—স° উৎ-তাপিত ॥ * ॥ উল্লাল পাইলোঁ—স' উৎ-লল ধাতু ললনে। কৌতুক পাইল ॥ * ॥ উয়ে কুম্ভারের পণী—স' পবন হইতে পণী (পোআন)। স' পূ ধাতু হইতে পবন। পূ ধাতুর প লোপে উ ধাতু। উয়ে—পোড়ে। প-ণি ওড়িয়া ॥ * ॥ ওঁকার—স' ওঙ্কার। ওঁ-ধ্বনি। সারিগামার সা, বাঁশীর পোঁ।

কচাল—স' কচ, কেশ। কেশতুল্য সূক্ষ্ম তর্ক। প্রচঃ। ও° ॥ * ॥ কবল দস হাটাল—স° কবল, গ্রাস। ইহা হইতে বা° খামল। হাটাল—মাটাল, যে মৃত্তিকা শুখাইলে কঠিন পিণ্ড হয়। দশ খামল মাটাল। খামল, মুষ্টিপ্রমাণ। বোধ হয়, হাঁ-টা-ল হইবে ॥ * ॥ কপট নাট—কপট নাট্য। ও° নাট. ॥ * ॥ কপোলগণ (১৩৪)—পাঠপ্রমাদ। কপোল-যুগল। ছন্দোহেতু যু লুপ্ত। কিম্বা উচ্চারণে কপোলযুগল, কপোলগল ॥ * ॥ কলি,